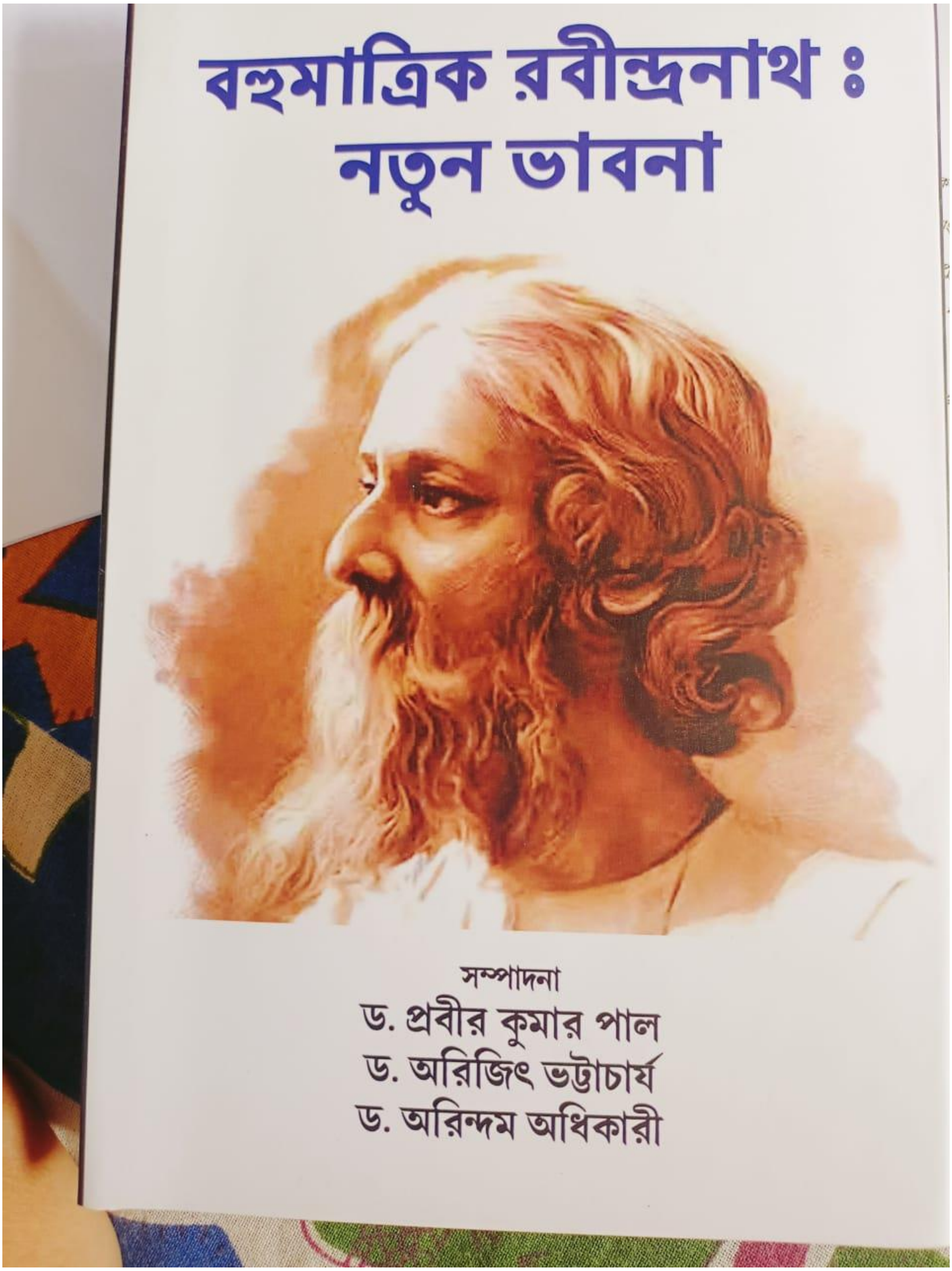

বহুমাত্রিক রবীন্দ্রনাথ ঃ নতুন ভাবনা

সম্পাদনা
ড. প্রবীর কুমার পাল
ড. অরিজিৎ ভট্টাচার্য
ড. অরিন্দম অধিকারী

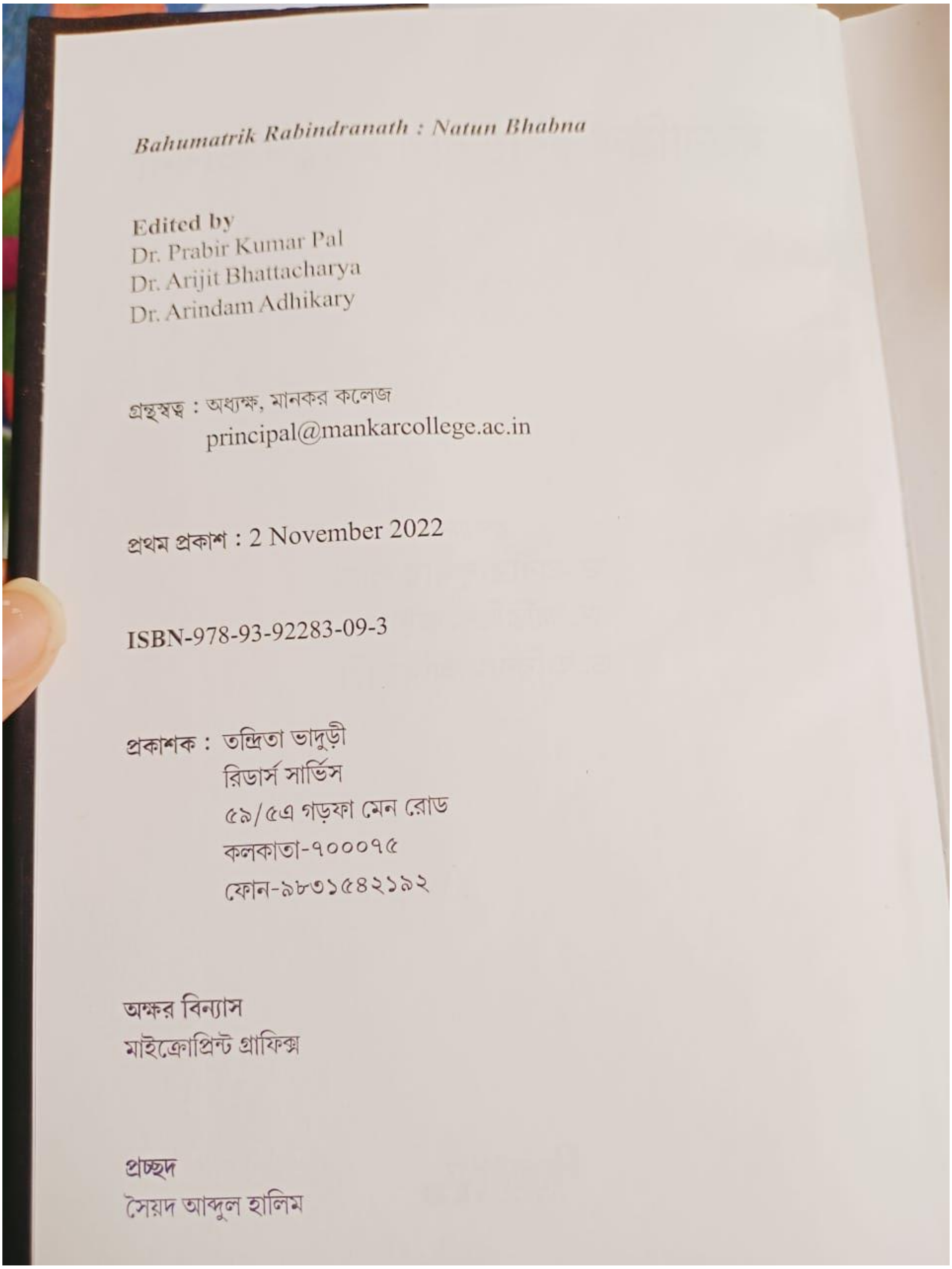

Bahumatrik Rabindranath : Natun Bhabna

Edited by
Dr. Prabir Kumar Pal
Dr. Arijit Bhattacharya
Dr. Arindam Adhikary

গ্রন্থস্বত্ব : অধ্যক্ষ, মানকর কলেজ
principal@mankarcollege.ac.in

প্রথম প্রকাশ : 2 November 2022

ISBN-978-93-92283-09-3

প্রকাশক : তন্দ্রিতা ভাদুড়ী
রিডার্স সার্ভিস
৫৯/৫এ গড়ফা মেন রোড
কলকাতা-৭০০০৭৫
ফোন-৯৮৩১৫৪২১৯২

অক্ষর বিন্যাস
মাইক্রোপ্রিন্ট গ্রাফিক্স

প্রচ্ছদ
সৈয়দ আব্দুল হালিম

॥ বিষয় সূচি ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধীর জাতীয়তাবাদী দর্শনের মতপার্থক্য ও সৌজন্যতাবোধ-প্রসঙ্গে সমকালীন পত্র ও পত্রিকা	ড. ঋতব্রত গোস্বামী	১৩
রবীন্দ্রনাথের ছড়া : হিংস্রতার কাব্যরূপ	সংগীতা রায়	২৪
'শেষের কবিতা'— নারীর স্বতন্ত্র হয়ে ওঠার আখ্যান	ড. অমৃতা ঘোষাল	৩৬
রবির কাছে 'উৎসব'	মাধোবিকা বণিক	৪০
পারিবারিক সম্পর্কের বিন্যাস ও 'গোরা' উপন্যাস	অসীম কুমার মুখার্জী	৪৮
রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যে নদীর স্থান	শুভাশিস গোস্বামী	৬৩
রবীন্দ্রনাথের গানে অভিসার-ভাবনা: বৈষ্ণব পদাবলীর ঐতিহ্যসন্ধান ও আধুনিকতার বিস্তার	ড. শুভময় ঘোষ	৭৬
রবীন্দ্র চিঠিপত্রে বিদ্যালয় ভাবনা-সূচনাপর্ব	পিঙ্কি দাস মুখোপাধ্যায়	৮৩
রবীন্দ্রদর্শনে মানুষের সত্তা	সুজয় গায়েন	৯০
মানবতাবাদ ও রবীন্দ্রনাথ	ড. নিরঙ্কুশ চক্রবর্ত্তী	৯৮
রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাঙ্কেতিক নাটকে গানের ভূমিকা	ড. শচীন্দ্রনাথ বালা	১০৩
ছড়ার কামচারিতা কামরূপধারিতা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ড: রীনা মণ্ডল	১১৩
একুশ শতক ও প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ	ড. গুরুপদ অধিকারী	১২০
রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু	রুপালী সরকার	১২৮
রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতা: কালান্তরের দুটি নির্মাণ	ড. লিপিকা ঘোষাল	১৩৬
রবীন্দ্র-গানে প্রকৃতি	অন্তরা দে	১৪৩
রবীন্দ্র উপন্যাসের আলোকে নবনীতা দেবসেন: একটি পর্যালোচনা	শতাব্দী বিশ্বাস	১৪৯
'চিত্রা' কাব্যে কবিসত্তা ও কর্মীসত্তার দ্বন্দ্ব	ড. প্রবীরকুমার পাল	১৫৮
রবীন্দ্র-সৃষ্টির একটি বিশেষ কালপর্ব : স্বদেশ ভাবনার জাগরণ	শুক্লা ব্যানার্জি	১৬৩
রবীন্দ্রনাথ ও রোমান্টিসিজম্	বিধানচন্দ্র রায়	১৬৯
বিশ শতকের আলোকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যুগ্ম-উপন্যাসে গ্রাম-শহর দ্বন্দ্বের অন্য অধিকার-বীক্ষা	বর্ষা চক্রবর্তী	১৭৪

।। রবীন্দ্রনাথের ‘সোনার তরী’ কাব্যে নদীর স্থান ।।

শুভাশিস গোস্বামী

১২৯৬ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে (নভেম্বর, ১৮৮৯) রবীন্দ্রনাথকে জমিদারি তদারক ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিতে হয়েছিল। তদানীন্তন উত্তরবঙ্গে ঠাকুর পরিবারের তিনটি বৃহৎ পরগণার জমিদারি ছিল—বিরাহিমপুর, কালিগ্রাম ও সাজাদপুর। বিরাহিমপুর পরগণার কাছারি ছিল শিলাইদহে, কালিগ্রাম পরগণার কাছারি পতিসরে আর সাজাদপুর গ্রামের নামেই পরগণা। ১২৯৬ বঙ্গাব্দের ১১ অগ্রাহয়ণ পত্নী মৃণালিনী দেবী, তাঁর এক সহচরী (অমলা দাশ), কন্যা বেলা, পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথকে নিয়ে যাত্রা করলেন শিলাইদহ। এর আগে একাধিকবার শিলাইদহে এলেও, পদ্মা নদীর সঙ্গে পরিচয় ঘটলেও প্রগাঢ় প্রণয় তখনও ঘটেনি। এবার শিলাইদহ অঞ্চলের পদ্মাপ্রকৃতি তথা গ্রাম বাংলার এক অনন্য সৌন্দর্য নতুনভাবে ধরা দিল তাঁর চোখে। ইন্দ্রিরাদেবীকে লিখেছেন—

“শিলাইদহে অপরপারে একটা চরের সামনে আমাদের বোট লাগানো আছে। প্রকাণ্ড চর—ধূ ধূ করছে—কোথাও শেষ দেখা যায় না—...পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়। এই যে ছোট নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে, এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতি রাত্রে শত সহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদ্যয় হচ্ছে, জগৎ সংসারে এ-যে কী একটা আশ্চর্য মহৎ ঘটনা তা এখানে থাকলে তবে বোঝা যায়।”[১] এমনই এক বিস্ময়-বিমুগ্ধ সৌন্দর্য দৃষ্টি নিয়ে রচিত হল রবীন্দ্র কবিজীবনের সবচেয়ে বড় অধ্যায়। শিলাইদহে কবি দেখেছেন প্রকৃতি ও মানুষের বিচিত্র বর্ণালী। আবিষ্কার করেছেন আপন অন্তরের সত্যকে। গ্রামের ঘাটে বাঁধা থাকত তাঁর বোট ‘পদ্মা’। শুনতেন নদীর কলধ্বনি মেশানো মানুষের ছোট ছোট সুখদুঃখের কথা। অবারিত ধান ক্ষেতের উত্তাল বাতাস, মিষ্টি মধুর ঘ্রাণ ভরিয়ে তুলত তাঁর প্রাণমন। এখানকার প্রকৃতির স্তব্ধ নির্মলতা, সীমাহীন ঘননীল আকাশ তাঁর মনে কখনো কখনো জন্ম দিয়েছে এক উদাসীনতারও।

কর্মসূত্রে টানা একটা দশক এখানকার পল্লীপ্রকৃতির সান্নিধ্যে অতিবাহিত করেছিলেন কবি। কিন্তু এই মুগ্ধতার পর্বটিকে আজীবন ভুলতে পারিনি। ‘সোনার তরী’ থেকে ‘জন্মদিনে’ পর্যন্ত নানা কাব্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে পদ্মা নদী তথা শিলাইদহ অঞ্চলের প্রকৃতির কথা। মৃত্যুর এক বছর পূর্বে লেখা ‘সোনার তরী’

॥ পারিবারিক সম্পর্কের বিন্যাস ও 'গোরা' উপন্যাস ॥

অসীমকুমার মুখার্জী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' উপন্যাসটি সামাজিক ও রাজনৈতিক ভবনার শ্রেষ্ঠ শিল্প রূপ হিসেবে পরিগণিত হবে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে অশান্ত সমাজ এবং বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক চেতনার আঘাতে তাঁর উপন্যাস এবার বিশালতর পটভূমিকায় জীবনের বৃহত্তর সমস্যার সমাধানে এসে দাঁড়াল। যুগ ধর্ম নরনারীর জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করতে পারে এবং রাজনীতি, স্বাদেশিকতা ও সমাজ সমস্যার উদ্বেল তরঙ্গমালা বাঙালি জীবনকে কতটা সংক্ষুব্ধ করেছিল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'গোরা' উপন্যাস। 'গোরা' থেকেই রবীন্দ্রনাথ হৃদয়গত সমস্যার সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিগত নানা সমস্যাকে মিলিয়ে নিয়ে কাহিনী গ্রন্থন করেছেন। পরবর্তীকালে 'ঘরে বাইরে' এবং 'চার অধ্যায়ে' তার বিস্তার ঘটেছে। 'গোরা'র কাহিনী কেবল গোরা—সুচরিতা, বিনয়—ললিতার প্রেম কাহিনী নয়, তৎকালীন বাংলার ধর্ম আন্দোলনের পটভূমিকায় জাতীয়তা, মানবতা ইত্যাদির সঙ্গে এর যোগাযোগ নিবিড়।

পারিবারিক কাঠামোকে বজায় রেখে কালোপযোগী এক নূতন জীবন ছন্দের কথা বলতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। স্বামী-স্ত্রীর বোঝাপড়া, পরিবার ভুক্ত অন্যদের সঙ্গে বোঝা পড়াতেও একটা নতুন ধারণার আভাস পাওয়া যায় তাঁর উপন্যাসে। যৌথ দায়িত্বই হল পরিবার চেতনার আদর্শ ভিত্তি। আর এই ভিত্তি নির্মিত হয় পারিবারিক সম্পর্কের সুদৃঢ় বন্ধনে। 'গোরা'র কাহিনী গ্রন্থনেই এই পরিবার বদ্ধ জীবনের নানা সম্পর্কের কথায় ব্যক্ত হয়েছে, যা আমাদের আলোচনার প্রধান বিষয়।

স্বামী-স্ত্রী: কৃষ্ণদয়াল ও আনন্দময়ী

'গোরা' উপন্যাসটি যে গোত্রেরই হোক না কেন, তাতে পারিবারিক জীবনের কথা মালার মতো গেঁথে রয়েছে। এই উপন্যাসে দুটি পরিবারের পরিচয়ই প্রধান হয়ে উঠেছে। কাহিনীর সূত্রপাত, বিস্তার ও পরিণতিও ঘটেছে এই পরিবার দুটিকে কেন্দ্র করে। উনিশ শতকের শেষ দিকে হিন্দু—ব্রাহ্ম বিরোধের পটভূমিতে একটি হিন্দু ও অপরটি ব্রাহ্ম পরিবারের চিত্র আছে। উভয় ক্ষেত্রেই পরিবার জীবনের আন্তর-ক্রিয়ার

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা কবিতা:
চর্চার বহুরৈখিকতা

সম্পাদনা

ড. প্রণবকুমার মাহাতো

কবিতিকা
KabitikA

Title : Swadhinata Uttar Bangla Kabita: Charchar Bohurikhikata
(A Collection of Bengali Essays)
Editors Name : Dr. Pranab Kumar Mahato

Published by Kamalesh Nanda on behalf of KABITIKA
e-mail : kabitika10@gmail.com Mob : 98321 30048
Web : www.kabitika.in
Publisher's Address : Kharagpur, Midnapore, West Bengal.
Printer's Details : Kabitika, Rajdanga Main Road, Kolkata- 700107

Edition Details : I
Cover Design : Kamalesh Nanda
Publication Date : 04.03.2023
Copyright © Saltora Netaji Centenary College
ISBN : 978-93-94830-67-7

Price : Rs. 350.00

সূচি

কবিতায় নারীর কথন : কবিতা সিংহ
অধ্যাপক জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায় ১৩

কালের কণ্ঠস্বরে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
অধ্যাপক মিলনকান্তি সৎপথী ২২

কলকাতার কবিতা : প্রসঙ্গ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ
অধ্যাপক তপন কুমার রায় ২৮

জীবন্ত জীবনের কবি— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ড. অরুণাভ মুখার্জী ৫২

নারীর সত্তা ও সংকট : নারীবাদী কবিতার আলোকে
ড. স্বর্ণকমল গোস্বামী ৫৮

নির্মলেন্দু গুণের কবিতা : প্রেক্ষিত ভাষা আন্দোলন
শুভম চ্যাটার্জ্জী ৬৯

প্রান্তিকায়িতের প্রতিনিধি : কবিতায় নারী-ভাবনা এবং মল্লিকা সেনগুপ্তের কলম
ড. সুলগ্না খান ৭৮

প্রকৃতি ও মৃত্যুচেতনার আলোকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা
প্রদীপকুমার পাত্র ৮৯

জীবন্ত জীবনের কবি— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ড. অরুণাভ মুখার্জী

আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে ‘নীললোহিত’ ওরফে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এক অনন্য সাধারণ নাম। তাঁর ‘আত্মিক অভিজ্ঞান’ ও ‘অন্তর্দৃষ্টি’, সব থেকে গাঢ় ও গূঢ় তাঁর কবিতায়। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা জগতের সুবিখ্যাত কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২৩ অক্টোবর ২০১২ খ্রিস্টাব্দে আমাদের কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন, যার জন্ম ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ৭ সেপ্টেম্বর অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুরে। বাংলা কবিতার জগতে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ ১৯৫১ সালে ‘দেশ’ পত্রিকায় ‘একটি চিঠি’ কবিতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এরপর কৃত্তিবাস’ (১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ) ত্রৈমাসিক পত্রিকার মধ্য দিয়ে বাংলা কবিতা আন্দোলনের রূপরেখা নির্মাণ করেছেন, কবিতার আন্দোলনকে বয়ে নিয়ে গেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকায় সমকালীন “তরুণ কবিরা জেনেশুনেই কাল-পরিবেশ মন্থনজাত বিষ আকণ্ঠ পান করে বাংলা কবিতার নতুন মোড় ফেরানোর আন্দোলন শুরু করলেন— অস্বীকার করলেন পূর্ববর্তীদের কায়দায় কবিতা বানানোর খেলা খেলতে। এঁদের কবিতা ‘লেখা লেখা খেলা’ নয়, এঁদের কবিতায় রক্তাক্ত জীবন যাপন”।[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন—

“শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম, শুধু কবিতার
জন্য কিছু খেলা, শুধু কবিতার জন্য একা হিম সন্ধ্যেবেলা
ভুবন পেরিয়ে আসা, শুধু কবিতার জন্য
অপলক মুখশ্রীর শান্তি একঝলক;
শুধু কবিতার জন্য তুমি নারী, শুধু
কবিতার জন্য এতো রক্তপাত . . .।”[২]

हिन्दी नाटक के विविध आयाम

डॉ. बिजय रवानी

हिंदी नाटक के विविध आयाम

© डॉ. बिजय रवानी

प्रकाशक :
आनन्द प्रकाशन
176/178, रवीन्द्र सरणी
कोलकाता - 700007
E-mail : anandprakashan@gmail.com

ISBN : 978-93-93378-09-5

प्रथम संस्करण : 2022

मूल्य : 695.00

मुद्रक :
रूचि प्रिंटिंग
कोलकाता - 7

जाति आधारित सामंतवाद, काव्यात्मक न्याय और संवैधानिक न्याय-व्यवस्था

(संदर्भ : कोर्ट मार्शल)

गौतम सिंह राणा

आधुनिक हिंदी नाटककारों में स्वदेश दीपक का नाम कोई परिचय का मोहताज नहीं है। ये हिंदी के उन कुछ एक नाटककारों में से हैं, जिन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (सन् 2004) मिला हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने बहुत अधिक संख्या में नाटक लिखा है, जिसके लिए ये सम्मानित हुए हैं। बल्कि ये हिंदी नाटक के क्षेत्र में कालजयी कहानीकार गुलेरी जी के सदृश हैं, जिन्होंने केवल पाँच नाटकों के लेखन के बल पर आधुनिक हिंदी कालजयी नाटककारों की फेहरिस्त में खुद को शामिल किया है। इनके द्वारा लिखित पाँच नाटक हैं – बाल भगवान (1989), कोर्ट मार्शल (1991), जलता हुआ रथ (1998), सबसे उदास कविता (1998) और काल कोठरी (1999)।

'कोर्ट मार्शल' स्वदेश दीपक कृत एक ज्वलंत नाटक है। ज्वलंत इसलिए है क्योंकि नाटककार ने जाति आधारित सामंतवाद के मजबूत तंतुओं की पड़ताल भारतीय सेना जैसी उस सरकारी संस्थान में की है, जहाँ जाति अधारित आरक्षण की व्यवस्था ही नहीं है। इस तरह नाटककार ने इस नाटक के मार्फत आजादी के बाद से लेकर अब तक सरकारी संस्थानों में संविधान प्रदत्त जाति आधारित आरक्षण को खत्म करने या, फिर लागू रखने के विवाद पर पुनर्चर्चा का एक प्लेटफार्म प्रदान किया है जो कि देश के अन्यतम ज्वलंत मुद्दों में से एक है। इस नाटक के कथानक के मूल में अपराधी जवान रामचंदर है। वह दलित वर्ग से संबंधित है। उस पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चल रही है। उसने कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर पर गोली चलाने का अपराध किया है, जिसमें कैप्टन वर्मा की मृत्यु हो गई है और कैप्टन कपूर मरने से बाल–बाल बचा है। सभापति जज कर्नल सूरत

िंह के समक्ष सरकारी वकील मेजर अजय पुरी बारी–बारी से अपने गवाहों को पेश करता है। वह अपने उद्देश्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है क्योंकि इसमें अपराधी जवान रामचंदर का गुनाह–ए–इकबाल बड़ी भूमिका निभाता है। बचाव पक्ष का वकील कैप्टन बिकाश राय भी इस बिंदू को झूठलाने की रत्तीभर भी कोशिश नहीं करता है क्योंकि उसका उद्देश्य हत्या के मूल में निहित सच्चाई को सामने लाने का होता है न कि रामचंदर को हत्या के मामले से बरी करने का। वह अपने वाक् पटु जिरह के मार्फत् इस हत्या के पीछे निहित कड़वी सच्चाई को सबके समक्ष लाने में सफल होता है। सच्चाई यह निकलती है कि कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर ने जाति आधारित सामंतवादी मानसिकता से ग्रसित होकर जवान रामचंदर को घोर अमानवीय मानसिक पीड़ा देने का काम करते हैं और वह पीड़ा असहनीय होकर तब प्रतिकार के रुप में सामने आती है, जब उसके गौरवर्णा होने के कारण उसके माता के चरित्र पर कीचड़ उछाला जाता है। यह पीड़ा उसके लिए असहनीय हो जाता है और वह अपनी नौकरी व जान की परवाह किये बिना उन दोनों सवर्ण अफसरों पर गोली चला देता है। कोर्ट परिसर में इस सच्चाई के सामने आने से परेशान होकर कैप्टन कपूर नेपथ्य में जाकर आत्महत्या कर लेता है। बावजूद इसके सेना कानून से बंधे जज सूरत सिंह इस मृत्यु को काव्यात्मक न्याय की संज्ञा देते हुए रामचंदर को अगले दिन फाँसी की सजा देने का निर्णय कर लेता है। नाटक का समापन इसी स्थिति में हो जाता है।

पूरे कथानक की बुनावट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके सभी अफसर पात्र रामचंदर से अपेक्षाकृत उच्च वर्ण से संबंधित हैं और उनमें से अधिकांश जाति आधारित सामंतवादी मानसिकता से ग्रसित हैं। कैप्टन कपूर, कैप्टन वर्मा, डॉक्टर कैप्टन गुप्ता आदि ऐसे ही पात्र हैं। कैप्टन कपूर और कैप्टन वर्मा की इस मानसिकता का सबसे अमानवीय और निकृष्टतम रुप उस समय सामने आता है, जब वे अपने घर पर चल रहे एक बर्थडे पार्टी में जवान रामचंदर को भरी महफिल में एक बच्ची के टट्टी को साफ करने का आदेश देता है और रामचंदर द्वारा उस आदेश को मानने से मना करने पर कैप्टन कपूर कहता है – "जात का चूहड़ा और टट्टी उठाने में शर्म आती है। तुम्हारे पुरखे पुश्तों से हमलोगों की टट्टी की टोकरी अपने सिर पर उठा रहे हैं।"[1] डॉक्टर कैप्टन गुप्ता तो सेना में एक डॉक्टर होने के बावजूद कैप्टन कपूर की बातों में आकर अपने कर्त्तव्य के विपरित जवान रामचंदर

के साथ अन्याय करता है। हो सकता है कि नाटककार ने अपने उद्देश्य की पुर्ति के बरक्स पात्र परिकल्पना की ऐसी परिपाटी बनाई हो। बावजूद इसके इस बात को खारिज तो नहीं ही किया जा सकता है क्योंकि सरकारी आँकड़े बहुत हद तक इसी बात की गवाही देते हैं।

जाति आधारित सामंतवादी मानसिकता की सबसे बड़ी खराबी यह है कि इससे ग्रसित लोग स्वयं को समाज में मान्य समस्त सम्माननीय पदों एवं कार्यों का जन्मना अधिकारी समझ बैठते हैं और साथ ही साथ स्वयं को रुलिंग क्लास का भी समझने लगते हैं। प्रस्तुत नाटक में इस मानसिक रोग का भी चित्रण मिलता है। नाटक के एक स्थल पर बचाव पक्ष के वकील कैप्टन बिकाश राय के तर्कपूर्ण प्रश्नों से परेशान होकर कैप्टन कपूर अपनी गलती का एहसास करने के बजाय कह ही बैठता है – "अब खानदानी लोग फौज में भरती नहीं होते। नीची जाति के लोगों को भरती किया जाएगा तो यही होगा। बात–बात पर शिकायत और शैमिंग।"[2] इस पर जब बिकाश राय कैप्टन कपूर से उसके खानदानी होने के बारे में जानना चाहता है तो कैप्टन कपूर बड़े गर्व से कहता है – "यैस। पिछली चार पुश्तों से हमारे पुरखे राज कर रहे हैं। आई.सी.एस., आई.एफ.एस., आर्मी, नेवी, एअरफोर्स। सब जगह अफसर हैं हमारे खानदान के लोग। वी बिलांग टू रुलिंग क्लात।"[3]

जाति आधारित सामंतवादी मानसिकता के संदर्भ में इस बात को झूठलाया नहीं जा सकता है कि इस मानसिकता से ग्रसित लोगों में एक मजबूत भाईचारे का रिश्ता होता है, जिसे वे सभी बड़ी ईमानदारी के साथ निभाते भी हैं। नाटक में यह भाईचारा कैप्टन कपूर, कैप्टन वर्मा और डॉक्टर कैप्टन गुप्ता के बीच देखने को मिलता है। वे सभी एक दूसरे के साथ मिलकर इस मानसिकता के अनुरुप कार्य भी करते हैं और साथ ही वे एक दूसरे की कारस्तानियों को छिपाने के लिए एक दूसरे के साथ खड़े भी मिलते हैं। नाटक के विभिन्न स्थलों पर इस मानसिकता का खुलासा होते देखा जा सकता है। मसलन कैप्टन वर्मा का कैप्टन कपूर द्वारा रामचंदर पर अमानवीय मानसिक यातना देने में सहभागी होना और डॉक्टर कैप्टन गुप्ता का कोर्ट में कैप्टन कपूर के पक्ष में गवाही देना। पर जहाँ कैप्टन कपूर इसी भाईचारे की उम्मीद लेकर कैप्टन बिकाश राय से पहल करता है तो प्रत्युत्तर में मिले जवाब से वहाँ यह और भी स्पष्ट रुप में प्रकट होता दिखता है– "कैप्टन कपूर ! इस अफसरोंवाले हरामी भाईचारे को भूल जाओ।"[4]

हम इस बात को भी नकार नहीं सकते हैं कि भारतीय समाज में पितृसत्ता

की भावना जाति आधारित सामंतवादी मानसिकता के समानांतर अपेक्षाकृत तीव्र वेग से चली आ रही है। बहुत लंबे काल से आलम तो यह बना हुआ है कि जाति आधारित सामंती मानसिकता जहाँ समाज के केवल तथाकथित उच्चवर्णीय लोगों तक सीमित एक मानसिक रोग है, वहीं पितृसत्ता की भावना से तो समाज के सभी वर्णों के पुरुष ग्रसित हैं। हाँ, पितृसत्ता की भावना के संदर्भ में यह बात लक्षित किया जा सकता है कि इस भावना का घनत्व उच्चवर्णीय पुरुषों में अपेक्षाकृत अधिक होता है। प्रस्तुत नाटक के पात्र कैप्टन कपूर में हमें यह घनत्व देखने को मिलता है। एक रात जब कैप्टन कपूर की पत्नी नशे में धुत होने के वजह से उसके साथ सोने से मना करती है तो प्रत्युत्तर में दिये गये कैप्टन कपूर के व्यवहार में इस तथ्य को लक्षित किया जाता है। कैप्टन कपूर अपनी पत्नी का गाउन फाड़ डालता है और कहता है – "आई हैव लाइसेंस टु स्लीप वीद यू। चुपचाप आ जाओ बिस्तर पर। जानती नहीं मैं कौन होता हूँ? कपूर !"[5] यही कारण है कि उच्च वर्ण और दुराचार के बीच के संबंध के संदर्भ में पेरियार ई.वी. रामासामी का भी कहना रहा है – "अगर यह बात सत्य है कि दुराचार नाम की कोई वस्तु हैय और अगर चोरी, झूठ और मक्कारी उस दुराचार के अंग समझे जाते हैंय तो इन दुराचरणों के शिकार गरीब तथा अनपढ़ जनता की अपेक्षा राजा–महाराजा, पुरोहित, व्यापारी, वकील, राजनीतिज्ञ आदि व्यक्ति अधिक होते हैं। शोषक वर्ग ही गरीब जनता को सताते, धोखा देते, नीचा दिखाते तथा उनकी उन्नति में बाधा पहुँचाते हैं। यह अतिश्योक्ति नहीं होगी, यदि मैं यह कह डालूँ कि सामान्य रुप से दुराचरण इस शोषक वर्ग का अंग–प्रत्यंग है।"[6]

हमें इस बात को मानने में लेशमात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए कि जाति व्यवस्था और उससे जुड़ी जाति आधारित सामंतवादी मानसिकता ने हमारे देश और समाज का बहुत ही अहित किया है। समाज में निहित इस जाति व्यवस्था ने हमारे समाज को सदियों से अपने–अपने सामुदायिक हितों के रक्षार्थ एक दूसरे से अनवरत युद्ध करने वाले बहुतेरे छोटे–छोटे समूहों में बाँटकर रखने का काम किया है, जो कि एक नितांत समाज और देश विरोधी तत्व के रुप में काम करता आया है। इस संदर्भ में भीमराव अंबेडकर का मानना है – "समाज–विरोधी भावना जाति व्यवस्था का सबसे निकृष्टतम लक्षण है। यह समाज विरोधी भावना, अपने हितों की रक्षा करने की यह भावना विभिन्न जातियों के एक–दूसरे से विलगाव में जितने स्पष्ट रुप में

प्रकट होती है, उतने ही स्पष्ट रुप से राष्ट्रों के बीच एक–दूसरे से विलगाव में।"[7] बात केवल सामुदायिक हित तक सीमित हो तो भी वह समाज और देश के लिए उतना अधिक अहितकर नहीं होता है। पर जब बात किसी भी समुदाय से संबंधित व्यक्ति की उस प्रतिभा की हो, जिससे समाज और देश का मान बढ़े और साथ ही साथ आनेवाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले तो उस संदर्भ में जाति आधारित सामंतवादी मानसिकता देश और समाज के लिए बहुत ही अहितकर साबित होती है। नाटककार ने प्रस्तुत नाटक में इस संदर्भ पर भी बात की है। रामचंदर एक अच्छा एथलिट है। उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाँच हजार मीटर की दौड़ में कुछ अच्छा करने की अपार संभावना है। पर उससे एक अपराध हुआ है कि उसने एक दलित के घर जन्म लेकर इस स्पर्धा में रेजिमेंट के पूर्व चैम्पियन कैप्टन कपूर का रिकार्ड तोड़ दिया है। इसके लिए उसे खामियाजा यह भुगतना पड़ता है कि कैप्टन कपूर उसे अच्छे से ट्रेन करने के बहाने अपने घर की संतरी की ड्यूटी लगवाकर उसकी प्रतिभा को खत्म करने का षड़यंत्र रचता है और उसमें वह अपने सहयोगियों के मदद से सफल भी होता है। वही रामचंदर जिसमें एशियाड के रिकार्ड को तोड़ने की संभावना है, वह सेना के उत्तरी कमान के खेलों में सेना तक का रिकार्ड तोड़ नहीं पाता है। इसके बाद तो वह हादसा ही हो जाता है। इस बात का खुलासा तब होता है जब कैप्टन बिकाश राय के जिरह के दौरान गवाह लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रजेंद्र रावत कह बैठता है –"सेना का क्या, रामचंदर एशिया का रिकार्ड तोड़ सकता था। लेकिन इंटर–कमांड मुकाबलों से पहले ही यह हादसा हो गया। ही कुड हैव वन एशियन गोल्ड मैडल फॉर अस। मेरी रेजिमेंट का रामचंदर, एशिया का सबसे तेज दौड़नेवाला रामचंदर !"[8]

प्रस्तुत नाटक में नाटककार ने केवल जाति आधारित सामंती मानसिकता के कुप्रभावों का ही चित्रण नहीं किया है, बल्कि उसने आजादी के पूर्व से लेकर आज तक अंग्रेजों ने व तत्पश्चात् भारतीय संविधान ने इस मानसिकता को खत्म करने के लिए जो कठोर कानून बनाये हैं, उनकी मौजूदगी के बावजूद इस मानसिकता के बने रहने के कुछ एक कारणों का पर भी प्रकाश डाला है। यह निर्विवादित सत्य है कि आजादी के बाद से लेकर आज तक भारत सरकार की लोककल्याण नीति के तहत अनुसूचित जाति के लोगों की साक्षरता दर में काफी बढ़ोतरी हुई है, बावजूद इसके इनके दब्बू, डरपोक व कायर स्वभाव में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ पाया है। ये पढ़–लिखकर साक्षर तो

बन गये हैं पर शिक्षित होने (चेतना–जागृति) के मामले में आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं। इनमें से अधिकांशतः अपने संवैधानिक अधिकारों से अनभिज्ञ हैं और जो भिज्ञ हैं, वे भी अपने दब्बू, डरपोक व कायर स्वभाव के कारण इसका इस्तेमाल करने से चूक जाते हैं। नाटककार ने इस सत्य का उदघाटन नाटक के उस स्थल पर किया है, जहाँ बचाव पक्ष का वकील कैप्टन बिकाश राय रामचंदर से कुछ सवाल पूछने के मार्फत पूरे प्रकरण के भीतर छुपे सत्य को सबके समक्ष लाने की कोशिश करता है और रामचंदर कुछ भी बताने से मना कर देता है तो क्रोधित होकर बिकाश राय कह बैठता है – "तुम छोटे लोगों को कानून और संविधान चाहो बराबर के अधिकार दे, लेकिन तुम हमेशा वही के वही रहोगे। दब्बू ! डरपोक ! कायर !"[9]

आजादी के इतने वर्षों बाद भी भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि संविधान प्रदत्त अधिकारों व अनुसूचित जाति उत्पीड़न के लिए कठोर दंडविधान के प्रावधान के बावजूद भी दलित शोषण के मामले में उतनी कमी नहीं आई है, जितनी उम्मीद संविधान बनाते समय की गई थी। इसका मूल कारण जाति आधारित सामंती मानसिकता ही है। इसके कारण ही समाज में बड़े–छोटे का भेदभाव है और संविधान प्रदत्त बराबरी का दर्जा एवं अधिकार का हनन हुआ है। बड़ों ने छोटों को कभी भी बराबरी का दर्जा नहीं दिया है जो किसी भी समाज के आस्तित्व के लिए खतरे का संकेत है। नाटककार ने अपनी इस चिंता को भी इस नाटक में शामिल किया है। इसे वे नाटक के पात्र बिकाश राय के इस कथन के मार्फत प्रकट करते हैं – "कानून और संविधान ने सबकों बराबर का दर्जा, बराबर का अधिकार दे दिया। लेकिन बड़े आदमी ने छोटे आदमी को, ऊँचे आदमी ने नाचे आदमी को , यह अधिकार नहीं दिया। बिल्कुल नहीं दिया। जो व्यवस्था, जो समाज जाति–भेद के आधार पर चलेगा, ऊँच–नीच के तराजू में आदमी को तौलेगा, उसकी आयु कभी लंबी नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती।"[10]

प्रस्तुत नाटक का सबसे महत्वपूर्ण स्थल नाटक का समापन है। नाटक का समापन स्थल प्रत्येक पाठक के मन मे एक टीस छोड़ जाने का काम करता है। पूरे प्रकरण के भीतर निहित सत्य के सामने आने के बाद कैप्टन कपूर द्वारा आत्महत्या करने तक के मामले को तो प्रत्येक सहृदय पाठक स्वीकार कर लेता है, पर रामचंदर के लिए मुकर्रर फाँसी की सजा उनके मन को टीस दे जाने का काम करती है। संवैधानिक न्याय–व्यवस्था की परिपाटी से बँधा हमारा मस्तिष्क भले ही रामचंदर के लिए मुकर्रर फाँसी

की सजा को मान लेता है, पर मन नहीं मान पाता है और यहीं से हमारे मन में संवैधानिक न्याय–व्यवस्था के अधुरेपन की भावना बलवती हो उठती है। मन में यह सवाल बड़ी तेजी से उठता है कि क्या सभ्यता की इतनी लंबी यात्रा तय कर लेने के पश्चात् भी हमें उचित न्याय के लिए संवैधानिक न्याय–व्यवस्था की उपस्थिति के बावजूद सभापति जज सूरत सिंह के इस कथन(पोएटिक जस्टिस वाले) पर आश्रित रहना पड़ेगा – "जब दुनिया की अदालत इंसाफ न कर सके तो कभी–कभी ऊपरवाला इंसाफ कर देता है।"[11] कहने का तात्पर्य है कि जिस जाति आधारित सामंती मानसिकता ने रामचंदर को अदृश्य रुप में कई बार मृत्यू के घाट उतारने का काम किया है, उसके लिए आज भी उसे काव्यात्मक न्याय पर निर्भर क्यों रहना पड़ेगा? हम समय रहते इस सच्चाई के प्रति क्यों नहीं चेत जाते कि यह मानसिकता केवल भारत ही नहीं पूरी दूनिया में किसी न किसी रूप में मौजूद है और पूरी दूनिया को खोखला बनाने का काम कर रही है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि जाति आधारित सामंतवाद, काव्यात्मक न्याय और संवैधानिक न्याय–व्यवस्था के त्रिकोण में रचित प्रस्तुत नाटक भारतीय सेना में निहित जाति आधारित सामंतवाद के तंतुओं की शिनाख्त के मार्फत् पूरी दुनिया में व्याप्त वर्ण, जाति और श्रेष्ठताबोध के घातक दुष्परिणामों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करता है। यह चिंता पूरे विश्व में संपूर्ण मानवता की स्थापना की चिंता है और एक सच्चे कलाकार–नाट्यकार का यह कर्तव्य ही होता है कि इस तरह की चिंताओं के मूल में निहित सच्चाई को सबके सामने लाने का संघर्ष बड़ी शिद्दत और ईमानदारी से करे और स्वदेश दीपक ने यही किया भी है। यही कारण है कि इस नाटक के संदर्भ में पाकिस्तान के ख्यातिलब्ध नाट्य–निर्देशक सुनिल शंकर का कहना है – "यह नाटक महज सेना में जाति व्यवस्था के बारे में नहीं है। नाटक का मुख्य किरदार कहता है, 'मैं रामचंदर को बचाने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं सच्चाई के लिए लड़ रहा हूँ।' कभी–कभी मुझे लगता है स्वदेश दीपक भी यही करने की कोशिश कर रहे थे।"[12]

संदर्भ सूची

1. दीपक,स्वदेश, कोर्ट मार्शल और अन्य नाटक, जगरनॉट बुक्स, नई दिल्ली, संस्करण–2017, पृ. – 84
2. वही,पृ. – 89

3. वही, पृ. – 89
4. वही, पृ. – 64
5. वही, पृ. – 73
6. पेरियार, ई.वी. रामासामी, जाति–व्यवस्था और पितृ–व्यवस्था, राधाकृष्ण पेपरबैक्स, तीसरा संस्करण–2021, पृ.–50
7. अंबेडकर, डॉ भीमराव, जाति का विनाश, फारवर्ड प्रेस, नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण–2018, पृ.–67
8. दीपक,स्वदेश, कोर्ट मार्शल और अन्य नाटक, जगरनॉट बुक्स, नई दिल्ली, संस्करण–2017, पृ.–69
9. वही, पृ.–95
10. वही, पृ.–99
11. वही, पृ.–104
12. वही, पृ.–16

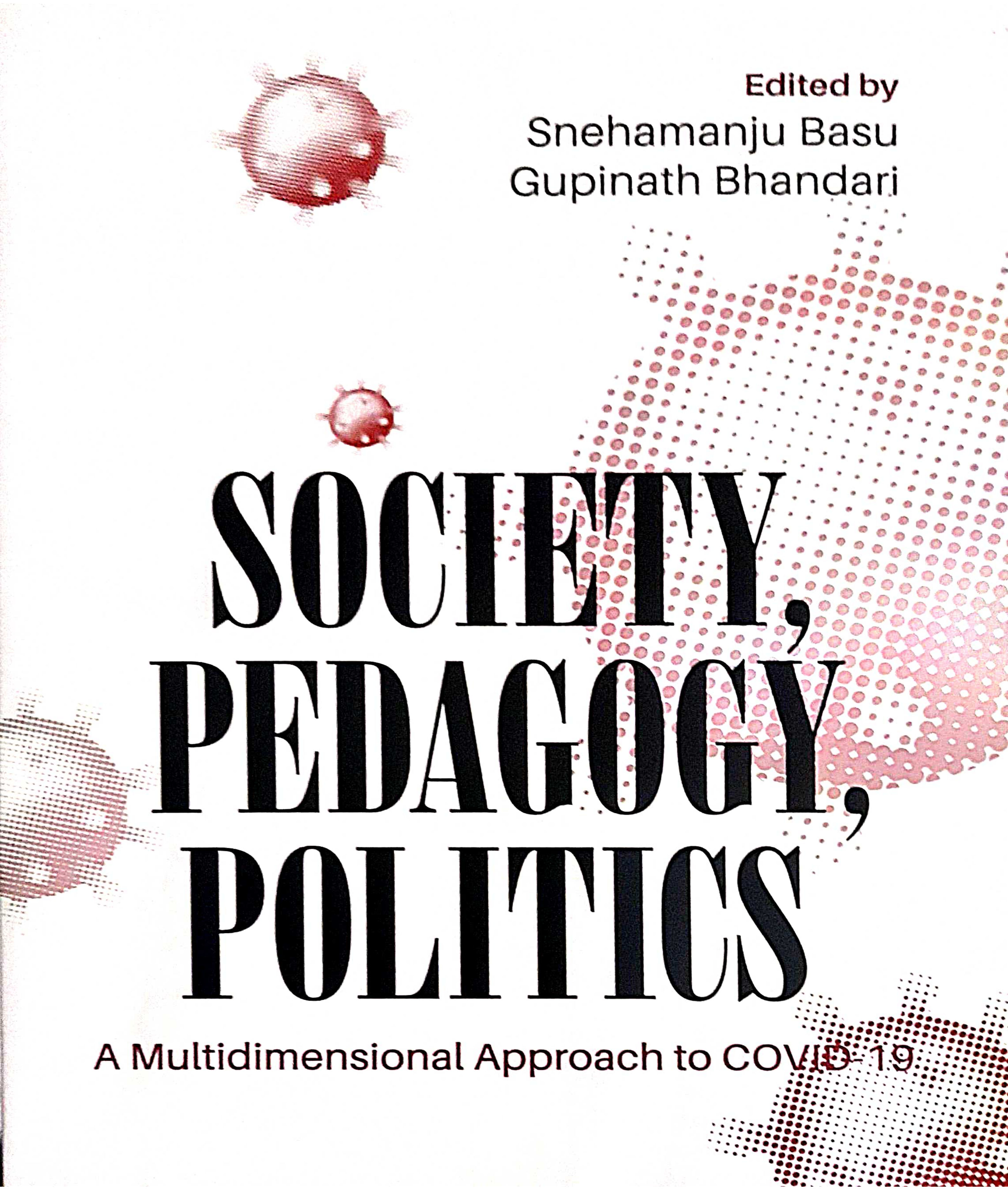

Edited by
Snehamanju Basu
Gupinath Bhandari

SOCIETY, PEDAGOGY, POLITICS

A Multidimensional Approach to COVID-19

Society, Pedagogy, Politics

A Multidimensional Approach to COVID-19

Edited by

Snehamanju Basu

and

Gupinath Bhandari

Jadavpur University Press
2022

CONTENTS

i. Foreword by the Pro-Vice-Chancellor vii

ii. Preface ix

iii. About the Editors xi

1. Learning Obstacles During the COVID-19 Pandemic and the Quest for a Solution: A Practical Experiment 1
Gupinath Bhandari, Chandrima Bandopadhyay

2. A Study on the Impact of COVID-19 on Learning Systems and the Experience of Growing Up 12
Gupinath Bhandari, Sayanti Kar, Indrajit Ghosh, Tanya Gupta, Debasmita Sen, Souporno Bhattacharya

3. Factors Influencing Education during the COVID-19 Situation 24
Arpita Ghosh, Dipyaman Pal, Chandrima Chakraborty

4. A Study on the Impact of COVID-19 Lockdowns on the Division of Domestic Work: A Gendered Scenario 48
Monalisa Patra

5. A Study on the Impact of the COVID-19 Pandemic on the Mental Stress of Students in Purulia District 62
Sharmistha Mukherjee, Shubham Ghosh, Soumili Dutta and Gupinath Bhandari

6. Violence against Women and Children in Pandemic 76
Bishnupada Nanda

7. Demystifying Creation: Assessing Cultural Novelties in the Pandemic-World 82
Atmadeep Ghoshal

8. Discovering Socially: A Mirrored View of the Pandemic 91
Sanjib Pramanick

9. The Impact of COVID-19 on Air Quality in Howrah 104
Bhaswati Sarkar, Suranjana Daw

A STUDY ON THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE MENTAL STRESS OF STUDENTS IN PURULIA DISTRICT

Sharmistha Mukherjee[1], Shubham Ghosh[2],
Soumili Dutta[2], Gupinath Bhandari[3]

Abstract

During a pandemic, stress, anxiety, grief, and worry are inevitable additions to physical threats, since people are faced with great uncertainties. Therefore, it is reasonable to assume that impressionable young students are experiencing stress in the context of the COVID-19 pandemic. Added to the fear of contracting the virus in this situation, the significant changes to our daily lives and the restrictions imposed upon our natural movement to slow the spread of the virus is also causing a lot of stress. Faced with the new realities of working from home, temporary unemployment, home-schooling of children, and a lack of physical contact with other family members, friends and colleagues, it is important that we look after our mental health in addition to our physical health. The WHO is continuously providing advisory guidelines for the public during the COVID-19 pandemic, and especially for groups such as health workers, managers of health facilities, people looking after children, older adults, and people in isolation, in order to help us look after our mental health. This paper tries to examine how young people

---

[1] Achhruram Memorial College, Jhalda, Purulia 723202: mukherjee.ruh23@gmail.com

[2] Sidho Kanho Birsha University:
ghoshshubham487@gmail.com; soumilidutta1996@gmail.com

[3] Jadavpur University, Kolkata 700032: gupinath.bhandari@jadavpuruniversity.in

are being affected mentally and facing stress during extended periods of home quarantine.

Key words: *mental stress; isolation; online studies; pandemic*

Introduction

Since December 2019, the COVID-19 pandemic has posed a substantial threat to human civilisation with the high mortality, infection rates, and risk of psychological stress associated with it. Just as other sections of society, a large number of students have been affected due to the prolonged break from academic activities and staying at home. (Chhetri et al. 2020) A pandemic is not just a medical phenomenon; it affects individuals and society and causes disruption, anxiety, stress, stigma, and xenophobia. The behaviour of an individual as a unit of society or a community has marked effects on the dynamics of a pandemic that involves the level of severity, degree of flow, and aftereffects. Rapid human-to-human transmission of the SARS-Cov-2 resulted in the enforcement of regional lockdowns to stem the further spread of the disease. Isolation, social distancing, and the closure of educational institutions, workplaces, and entertainment venues consigned people to their homes to help break the chain of transmission. COVID-19 affected everyone at global level. (Yasmin et al. 2020) However, the restrictive measures have undoubtedly affected the social and mental health of individuals across the board. As more and more people were forced to stay at home in self-isolation to prevent the further spread of the pathogen at the societal level, governments were required to take the necessary measures to provide mental health support as prescribed by the experts. The psychological state of an individual that contributes towards the community health varies from person to person and depends on his/her background as well as his/her professional and social standings. (Javed et al. 2020)

Objectives

The objectives are:

1. To find the source and magnitude of stress related to the COVID-19 pandemic situation on the minds of undergraduate students of Sidho Kanho Birsha University in Purulia.

2. To know the extent of teenagers' experience of anxiety, distress, social isolation, and an abusive environment, which can have short- or long-term effects on their mental health.
3. To find some common changes in learners' behaviour and their difficulties with concentration and attention.
4. To find the changes in, or avoidance of, activities that young learners enjoyed in the past, as also changes in their eating and sleeping habits.

Methods Of Study

We randomly selected 630 undergraduate (UG) students from practical and theorety-based disciplines who had previously dropped out due to financial reasons but have now returned to the mainstream. We prepared a google form and conducted most of the surveys through emails. Classifying the study into three parts, we first conducted a thorough quantitative and qualitative survey for six months at a stretch (June 2020 to November 2020). At the next stage, we analysed the data to make a comprehensive quantitative study on the real and proper situation of homebound students. The statistical scores for the samples of those who responded were calculated and the demographic variables analysed. During the final stage, we conducted personal interrogation and evaluation to determine which cases were more complicated, so as to understand the rationale behind them and find possible methods for alleviation where needed.

Present State and Situation

The COVID-19 pandemic has had a major effect on all our lives. Many of us are facing challenges that can be stressful, overwhelming, and can cause strong emotions. Public health actions, such as social distancing, are necessary to reduce the spread of COVID-19, but they can make us feel isolated and lonely and can increase stress and anxiety. Stress among UG students can cause the following: 1. Increased feelings of fear, anger, sadness, worry, numbness, or frustration, 2. Changes in regular going out, 3. Difficulty concentrating and making decisions, 4. lack of guidance and cooperation, 5. Worsening of the study environment, 6. Worsening of mental health conditions, 7. Increased use of tobacco, alcohol, and other substances due to lack of other entertainment, 8. Family members may witness any of the following changes to the behaviour of older relatives: (a) irritability and shouting; (b) change in their sleeping and eating patterns; and (c) emotional outbursts

We have tried to understand the effects of the COVID-19 outbreak on the mental health of various age groupes of students, depending on their clinical features, transmission patterns, and management.

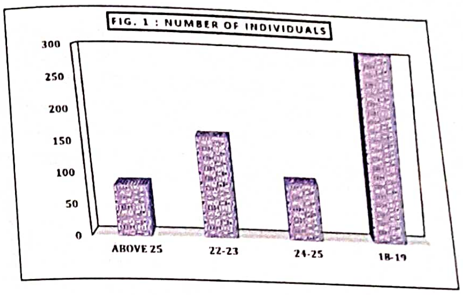
FIG. 1 : NUMBER OF INDIVIDUALS

Data Interpretation and Analysis

Among the 640 students surveyed, most were 19 years old or less (Fig. 1) and 87% of them were living with their family. Of the total sample studied, 57% of the live in rural areas, while 30% live in urban areas and the rest live in the suburb. We came to know through the survey that 540 of them, which means 77% of our sample, have had the opportunity of studying from home. (Fig. 2)

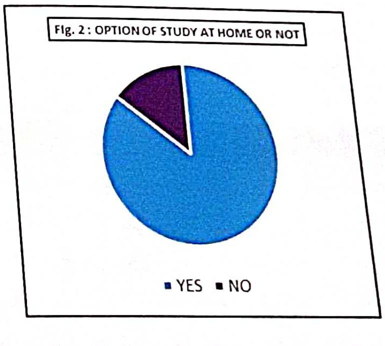
Fig. 2 : OPTION OF STUDY AT HOME OR NOT

Of the total number, 85% thought that the pattern of study became stressful, while the rest do not think so. Similarly, 66% of students understood the topics discussed through online study while 33% do not. This depicts a picture that demands a rethink. The students who do not think that the pattern of study was stressful, and who understood their studies online, had facilities like electricity, smartphones and internet connectivity. The COVID-19 pandemic and the resulting economic recession negatively affected the mental health of numerous people and created new barriers for people already suffering from mental illness. In our study too we found that most of the respondents tried to keep themselves engaged with mobile surfing and social media. (Fig. 3) Spending time with family members, including children and elderly people (only 6%), involvement in different healthy exercises and sports activities (13%), following a schedule/routine (19%), and taking a break from traditional and social media can all help to overcome mental health issues. (62%)

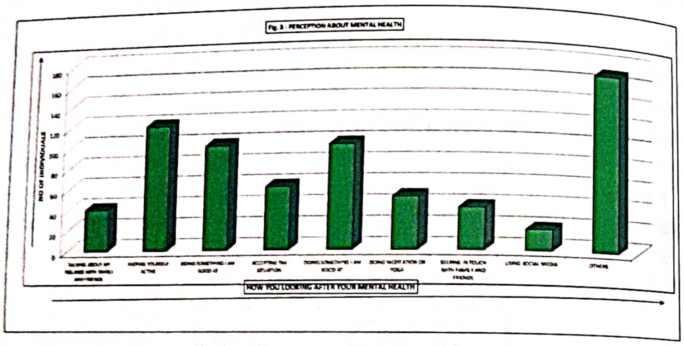
Fig. 3 : PERCEPTION ABOUT MENTAL HEALTH

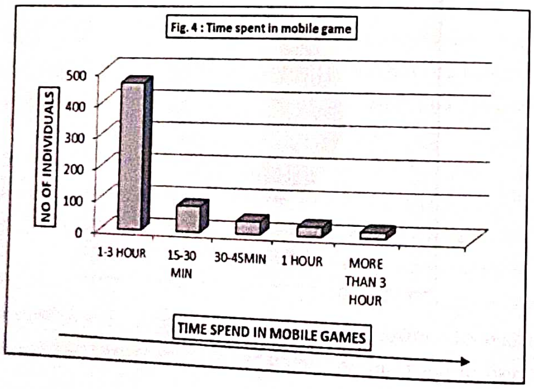
Fig. 4 : Time spent in mobile game

Of the respondents, 75% dedicated time to playing video games for more than three hours. The remaining 25% used online games for less than one hour. (Fig 4) When the question was put to the respondents as to whether they were worried about their futures or careers, we found that astonishingly only 33% of the respondents sometimes thought about their future. This indicates they are not worried about their careers or had lost interest in thinking about the future. This is a interesting finding, which shows us that home isolation had made most students pessimistic and disappointed. Only 25% of the respondents believed that there could a serious problem in the future because the normal flow of offline study has been disturbed. (Fig. 5)

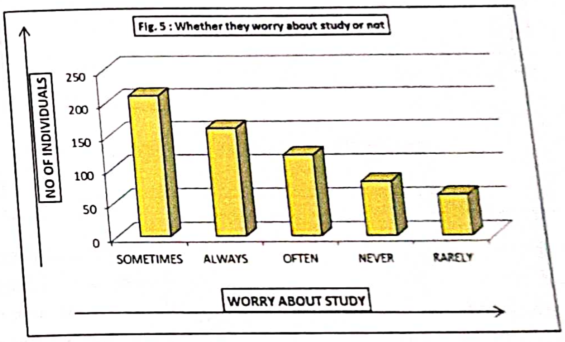
Fig. 5 : Whether they worry about study or not

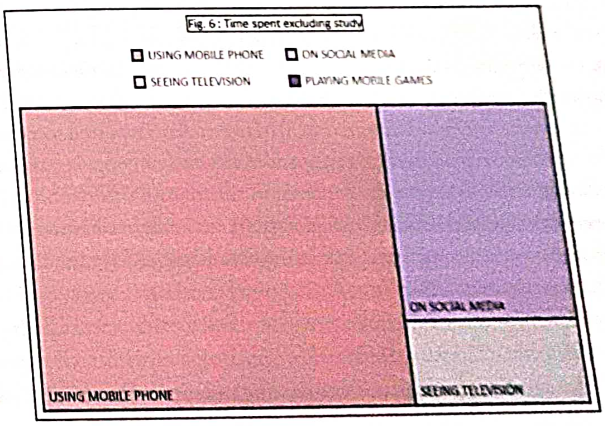
Fig. 6 : Time spent excluding study

Further, another added fact that is quite surprising is that 100% of respondents used mobiles and computers for surfing the internet when they are not studying or doing their regular jobs. Out of 630 samples, 310 learners used Facebook and other social media to express their grievances, joys and disappointments. (Fig. 6) Surprisingly, 60% of the learners came from low-income groups. (Fig. 7)

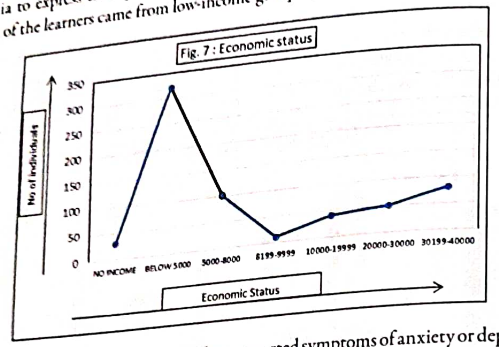
Fig. 7 : Economic status

During the pandemic, students have reported symptoms of anxiety or depressive disorders. A very interesting behavioural pattern has been revealed through their responses, which finds that 25% of the students thought that there was nothing to do by worrying about the pandemic situation. They feel that they have no control over the spread of the coronavirus because they cannot make everyone conscious about the disease at once, being confined to their homes themselves. So, they only sometimes think or worry about the real situation of the world outside. Of those surveyed, 60% of respondents stated that they were worried during the pandemic, while the rest of the students were totally indifferent. (Fig. 8) Many students reported specific negative impacts on their mental health. As the pandemic wears on, ongoing and necessary public health measures expose many people to situations linked with poor mental health outcomes, such as isolation and job loss. In our study, we have seen that 82% of respondents were suffering from negative impact and social disorders caused by the pandemic. Among them, 20% reported being really hopeless. (Fig. 9)

Some of them considered leaving home to find a safer place, which is often practially untenable. We have maintained personal contact with such respondents and provided as much as possible career counselling and support from our institution as possible. Of all the respondents, 73% of are very prone to losing their temper, and only 27% have reported being capable of controlling their emotional outbursts. (Fig 10)

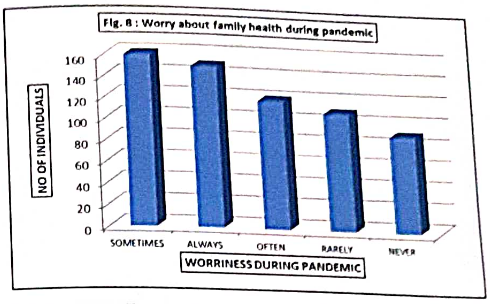
Fig. 8 : Worry about family health during pandemic

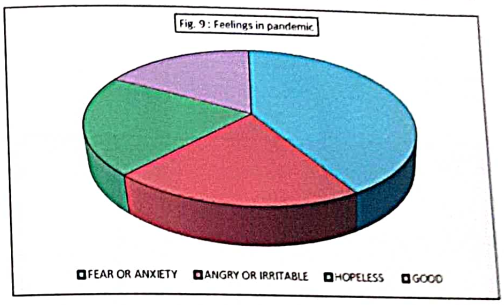
Fig. 9 : Feelings in pandemic

We asked the respondents whether the pre-corona period was better in terms of mental peace and life outside the home. For both questions, we found that that most people considered that the period before the pandemic was better for their mental peace because they were confined to their homes, could not go anywhere, and especially because they were barred from going to tuition or college on an overcrowded bus or train. They could study safely only from home. The percentage of respondents who thought that the corona period was better for mental peace totals 20%. The rest

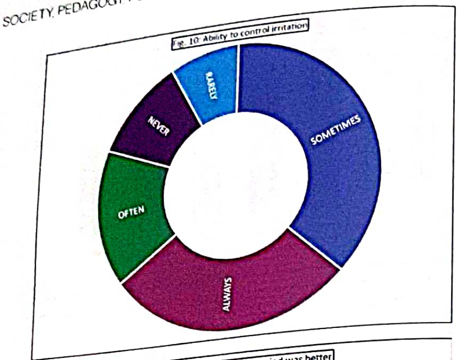
Fig. 10: Ability to control irritation

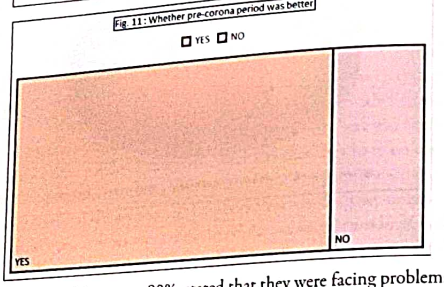
Fig. 11 : Whether pre-corona period was better

of the respondents, adding up to 80%, stated that they were facing problems or were under mental stress during the pandemic. (Fig. 11)

At the same time, a similar portion of the sample survey stated that the pre-corona period was not better for staying outdoors because of crowded streets. Now, however, they could go out safely with masks and sanitisers, maintaining social distancing norms. (Fig. 12) Consequently, the same number of students who were under mental stress (80%) responded that they were now more confident of solving their own problems in spite of the stress of the situation. (Fig. 13) When we asked them about how they felt overall during the pandemic, that is, whether they were stressed or nervous, 79% respondents said that they panicked either sometimes or often and the rest of the respondents never felt these things. (Fig. 14) During periods of elevated stress, they noticed abnormal behaviour towards relatives. Physical isolation at home among family members could also put elderly and disabled persons at serious risk of mental health issues. This could cause anxiety, distress, and induce a traumatic situation for them. Elderly people depended on younger ones for their daily needs, and self-isolation had the possibility of critically damaging a family system. Of our respondents, 7% behaved very roughly and 54% showed moderate to some harsh behaviour towards their older relatives. (Fig. 15) Physical distancing due to the COVID-19 outbreak could have extremely negative effects on the mental health of the respondents. A study reveals that 64% of people surveyed were worried about their income and financial condition as they thought that the period after the

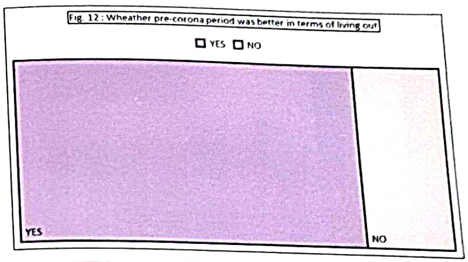
Fig. 12 : Wheather pre-corona period was better in terms of living out

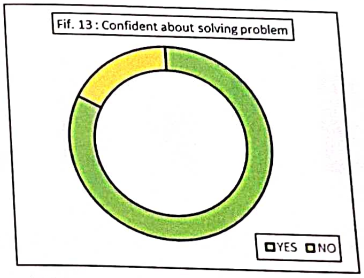
Fif. 13 : Confident about solving problem

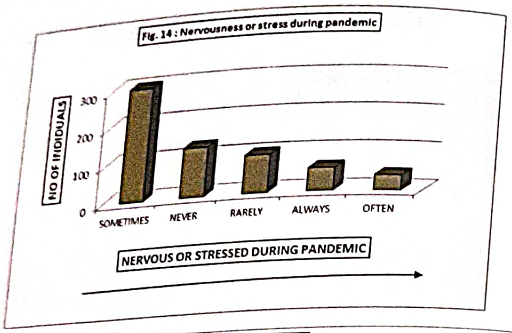
Fig. 14 : Nervousness or stress during pandemic

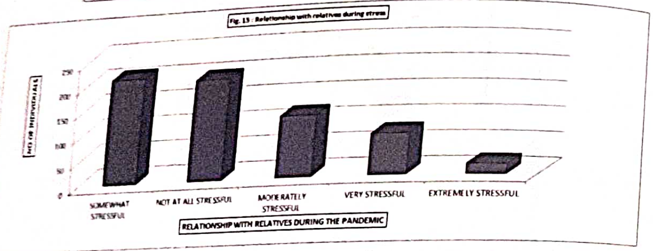
Fig. 15 : Relationship with relatives during stress

pandemic would be stressful, and the situation would be even harder in the future. The rest of the respondents were dependent on their parents from the very beginning and did not share the feelings of the former group. (Fig. 16)

Negative impacts on social well-being, such as difficulty sleeping (36%) or eating (32%) conversely increased alcohol consumption or substance use (12%) and the worsening of chronic conditions (12%) due to worry and stress over the coronavirus. Most of the students understood the full magnitude of this infective viral pandemic. The percentage of students who could and could not fully comprehend the situation stood at 84% and 16% respectively.

Outcome of the Study

Quarantine and self-isolation can most likely cause a negative impact on one's mental health. (Liu et al. 2020) A review published in *The Lancet* said that separation from loved ones, loss of freedom, boredom, and uncertainty could cause a deterioration in an individual's mental health status. We can specifically say that a homebound situation that extends for a long time definitely has an adverse effect on a person's mental health and well-being. Students have been forced to change their way of living life unexpectedly (WHO 2021), and this uncertainty has led to indifference. A we observe the events around the outbreak of the coronavirus stretch over time, i would not be strange to perceive increasing stress and panic. A medical bulletin a renowned hospital has the following quote: 'As the days go by, the stress can ad up and affect you both physically and mentally.' The information reaching us fro different sources about the pandemic can be both overwhelming and scary. Stude

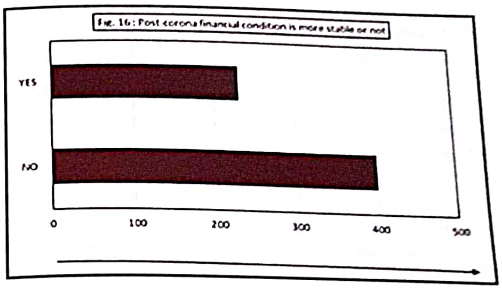
Fig. 16 : Post corona financial condition is more stable or not

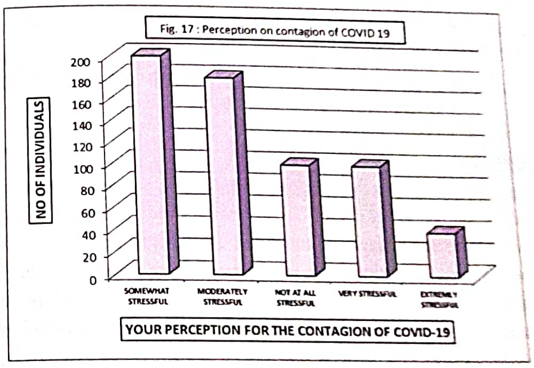
Fig. 17 : Perception on contagion of COVID 19

are experiencing anxiety and fear simply adjusting to the new situation. Therefore, managing stress around the outbreak and keeping ourselves in a positive frame of mind is necessary for our well-being. Simple steps like these can help bring us a sense of normalcy and help us cope with the changing environment. (WHO 2021) The following suggestions are being made to instructors and administrators based on the findings of the present study:

- Encourage students to reach out to a counsellor over the telephone if they are unable to manage their anxiety on their own.
- Advise the students to do exercise, maintain a healthy and immunity-boosting diet, become organised and practice good hygiene, and provide the necessary support so that they are able to follow through on these.
- Encourage the students to help others wherever possible, especially when a neighbour is sick or panicked.
- Suggested that students connect with others and find positive and constructive ways to express themselves. (CDC 2020)

Conclusion

To overcome the extraordinary situation created by the pandemic, measures at both the individual and the societal levels are necessary. Students across the country are experiencing a complex mixture of emotions. They might be put in a situation or environment that could be new and potentially damaging to their health. (Javed et al. 2020) Students, kept away from their colleges and friends, and forced to stay at home, may have many questions about the outbreak and they would naturally look towards their parents or caregivers for answers. Conversely, it must be remembered that not all children and parents respond to stress in the same way. The COVID-19 pandemic and its adverse social outcomes, can also result in increased stress, anxiety, and depression among teenagers already dealing with mental health issues. However, media coverage has highlighted COVID-19 as a unique threat, rather than one of many which have all added to panic, stress, and the potential for hysteria. (Moukaddam and Shah 2020) Therefore, public awareness campaigns focusing on the sustenance and improvement of good mental health for the duration of the pandemic, as well as afterwards when we have emerged from it, are urgently required.

References

1. Centres for Disease Control and Prevention (CDC). 2020. 'Mental Health and Coping during COVID-19.' May 03. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/coping.html.
2. Chhetri, B., L. M. Goyal, M. Mittal, G. Battineni. 2021. Estimating the Prevalence of Stress among Indian Students during the COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Study from India. *Journal of Taibah University Medical Sciences* 16 no. 2: 260–67. https://doi.org/10.1016/j.jtumed.2020.12.012.
3. Javed, B., A. Sarwer, E. B. Soto, and Z. U. Mashwani. 2020. 'The Coronavirus (COVID-19) Pandemic's Impact on Mental Health.' *The International Journal of Health Planning and Management* 35, no. 5: 993–96. https://doi.org/10.1002/hpm.3008.
4. Liu, J. J., Y. Bao, X. Huang, J. Shi, and L. Lu. 2020. 'Mental Health Considerations for Children Quarantined because of COVID-19.' *The Lancet: Child and Adolescent Health* 4 no. 5: 347–49. https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30096-1.
5. Mental Health Foundation. 2020. 'Looking after Your Mental Health during the Coronavirus Outbreak.' May 03. https://www.mentalhealth.org.uk/publications/looking-after-your-mental-health-during-coronavirus-outbreak.
6. Moukaddam, N., and A. Shah. 2020. 'Psychiatrists Beware! The Impact of COVID-19 and Pandemics on Mental Health.' *Psychiatric Times* 37 no. 3. https://www.psychiatrictimes.com/psychiatrists-beware-impact-coronavirus-pandemics-mental-health.
7. Sanchez Nicolas, E. 2020. 'WHO warning on lockdown mental health.' *Euobserver*, March 27. https://euobserver.com/coronavirus/147903.
8. World Health Organization (WHO). 2021. 'Mental Health and COVID-19.' May 27. https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/covid-19.
9. Yasmin, H., S. Khalil, and R. Mazhar. 2020. 'COVID-19: Stress Management among Students and its Impact on their Effective Learning.' *International Technology and Education Journal* 4, no. 2, 65–74.

Peasant & Labour Movement in Bengal

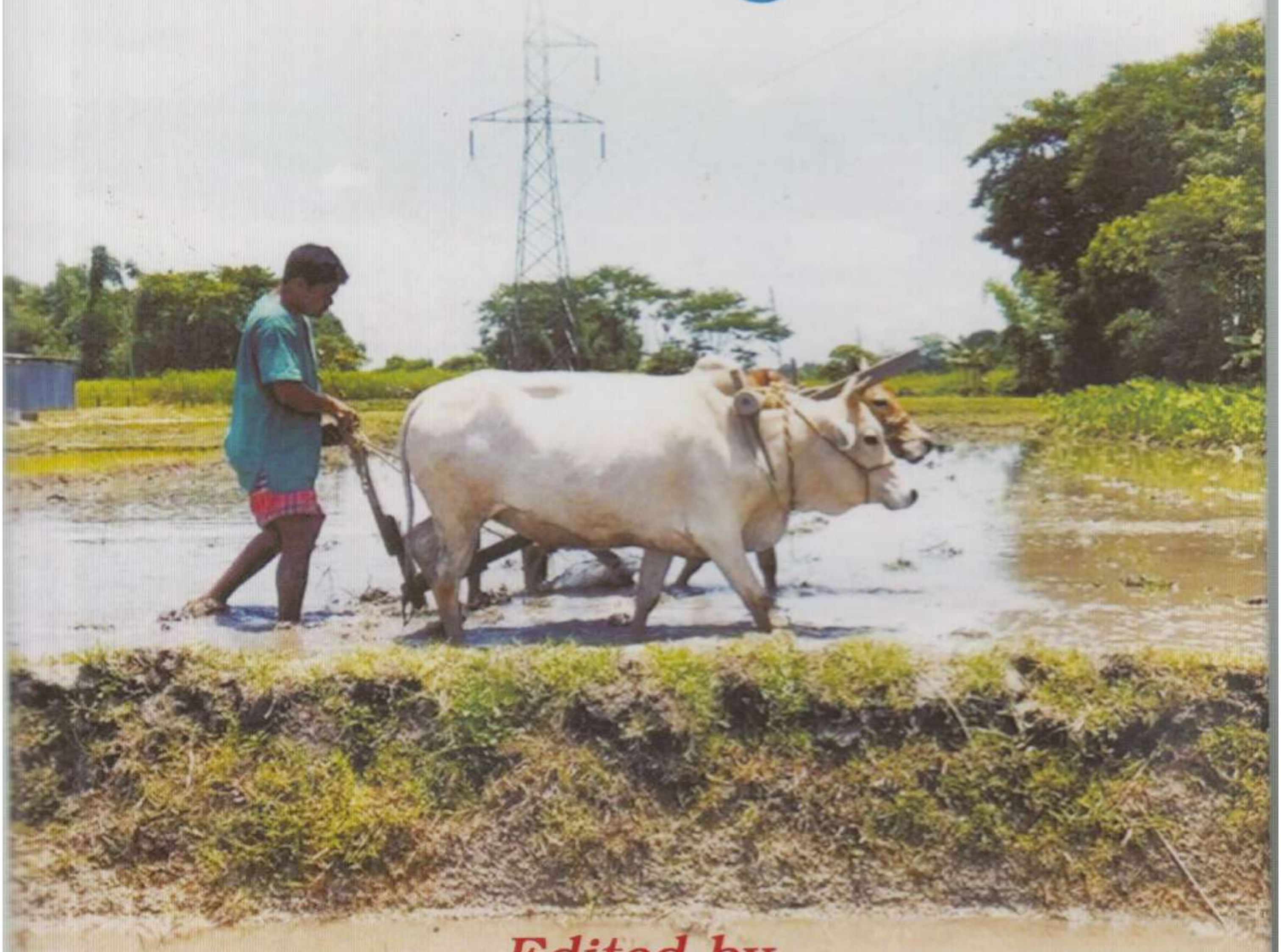

Edited by

Dr. Kartik Chandra Sutradhar
Kalikrishna Sutradhar

KUNAL BOOKS
4648/21, 1st Floor, Ansari Road,
Daryaganj, New Delhi - 110002.
Phones: 9811043697, 011-23275069
E-mail: *kunalbooks@gmail.com*
Website: *www.kunalbooks.com*

Peasant & Labour Movement in Bengal

Edited by:
Dr. Kartik Chandra Sutradhar
Kalikrishna Sutradhar

© Editors

First Published: July, 2022

ISBN : 978-93-91908-52-2

[All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission of the publisher].

All The Views are Solely Mentioned by the Authors. Neither the Editors Nor the Publisher are Responsible for any Comments, Statements in Each and Every Chapter of This Book

---

Published in India by Prem Singh Bisht for Kunal Books, and printed at **Trident Enterprises**, Noida, (U.P.).

This Book is Dedicated to

The Peasant & Labourer
to secrifice their life for
the Soceity

Dr. Supam Biswas: Assistant Professor in History, Baneswar Sarathibla Mahavidyalaay, Coochbehar, West Bengal, India.

Dr. Samar Kanti Chakrabartty: Assistant Professor in History, Acchuram Memorial College, Purulia, West Bengal, India.

Uday Sankar Sarkar: Assistant Professor in History, Bankura Zilla Saradamani Mahila Mahavidyapith, Bankura, West Bengal, India.

Ramendra Nath Bhowmick: Assistant Professor in History, Samuktala Sidhu Kanhu College, Alipurduar, West Bengal, India.

Sudip Bhattacharya: Assistant Professor in History, Maynaguri College, Jalpaiguri, West Bengal, India.

Shatrughan Kahar: Assistant Professor, Department of History, Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya, West Bengal, India.

Sagar Simlandy: Assistant Professor, Department of History, Sripat Sing College, Jiaganj, Murshidabad,, West Bengal, India.

Chandan Sarkar: SACT in History, Maynaguri College, Jalpaiguri, West Bengal, India.

Avijit Roy: SACT, Netaji Subhas Mahavidyalaya, Haldibari, Coochbehar and Phd Research Scholar, Department of History, Cooch Behar Panchanan Barma University, Cooch Behar, West Bengal, India.

Md Rakib Ali: Assistant Teacher, Talibpur High School, Birbhum, West Bengal, India.

Kalikrishna Sutradhar: Phd Research Scholar, Department of History, Cooch Behar Panchanan Barma University, Cooch Behar, West Bengal, India.

Rejaul Karim: PhD Research Scholar, Department of History, Cooch Behar Panchanan Barma University, Cooch Behar, West Bengal, India.

Sunita Mahato: NET & SET qualified, Former Student, Department of History, University of North Bengal, West Bengal, India.

Tanmay Barman: PhD Scholar, Department of History, University of Gour Banga, West Bengal, India.

Arup Dam: MPhil Research Scholar, Department of History, The University of Burdwan, West Bengal, India.

Chhotan Basak: PhD Research Scholar, Department of History, Cooch Behar Panchanan Barma University, Cooch Behar, West Bengal, India.

Dipankar Brman: PhD Research Scholar, Department of History, Raiganj University, Cooch Behar, West Bengal, India.

Contents

Editorial *v-xvi*
List of Contributors *xvii-xviii*

1. **Situating Sannyasi Rebellion in late 18th Century Cooch Behar: Readings in History** 01-17
Dr. Tahiti Sarkar
2. **Sannyasi and Fakir Resistance in North Bengal (1770-1800 C.E.): A Study of Conflicts of Interests and Initial Reaction against Colonial Rule** 18-27
Sudip Bhattacharya
3. **Sannyasi and Fakir Rebellion in North Bengal: A Study in Overt Form of Rebellion** 28-36
Sunita Mahato
4. **Chuar Revolt in South West Bengal: A Historical Analysis** 37-53
Uday Sankar Sarkar
5. **Rangpur Revolt: the most formidable Revolt of 1783** 54-64
Md Rakib Ali
6. **ঔপনিবেশিক কালে জঙ্গলমহলে আদিবাসী বিদ্রোহের বিভিন্ন পর্যায় ও প্রকৃতি** 65-79
Dr. Samar Kanti Chakrabartty
7. **The *Pagal panthis* movement of Mymensingh (1825-33): A Revisiting History** 80-87
Kalikrishna Sutradhar
8. **Indigo Plantation and Rebellion in Malda: A Historical Study** 88-98
Dipankar Barman

[10] Fort William Authority of Collector of Rangpur,13 January,1783,B.S.R., Rangpur District, Letter Received, Vol. 10, p.7

[11] Deposition of zehoor Busneah, 8 May,1785,B.S.R., Rangpur District, Miscellaneous Letter and Received, Vol. 417, pp .17-23; Kaviraj, Narahari,A Peasant uprising in Bengal,1992, p.62

[12] Deposition of A passoo Pyke, 6 April 1785, B.S.R., Rangpur District, Letter Received, Vol.15, p.43

[13] Roy, Suprakash, *Bharater Krishak Bidroha O Ganatantrik Sangram*, Radical Impression, Kolkata,1996,p.109

[14] Ibid, Kaviraj, Narahari,*Asamapta Biplob, Apurna Akanksha*,p.22

[15] Sen, Shailendranath, Advanced History of Modern India,Primus Books,2017, p.118

[16] Islam, Sirajul, *Banglar Itihas: Uponobeshik Shason Kathamo*,Novel Publishing House,p.290

[17] Roy, Shubhrajyoti, Transformation on the Bengal Frontier: Jalpaiguri-1765-1948, p.37, (Kacharis-These Kacharis were not only the most visible symbol of oppression but also contained the most important instrument of the oppression,the written records. The rebels were quick vto destroy all the records they could lay their hand on).

[18] Gazetteers of Rangpur District,p.30

[19] Ibid,p.30

[20] Khan Chowdhury Amanatulla Ahmed, History of Coochbehar,The State Press,1936, p.219

[21] Proceedings of the Committee of Circuit Dacca, 3rd Oct-28th November,1772, Vol.iv, pp.100-101

[22] Guha, Ranajit, Elementary aspects of Peasant Insurgency in Colonial India, Duke University Press,1999, p.6

[23] Islam, Sirajul, *Banglar Itihas-Uponobeshik Shason Kathamo*, p.334

[24] Ibid,pp.335-336

[25] Kaviraj, Narahari, A peasant uprising in Bengal, Peoples Publishing House, New Delhi,1992, p.39

[26] Roy, Shubhajyoti, Transformation on the Bengal Frontier: Jalpaiguri, 1765-1948, Routledge,2002,p.39

6

ঔপনিবেশিক কালে জঙ্গলমহলে আদিবাসী বিদ্রোহের বিভিন্ন পর্যায় ও প্রকৃতি

Dr. Samar Kanti Chakrabartty

ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট:- ঔপনিবেশিক বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের ভাগলপুর, মুঙ্গের, ধলভূম, মানভূম, সিংভূম, বাঁকুড়া ও সাঁওতাল পরগণার বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে "জঙ্গলমহল" অঞ্চল গড়ে ওঠে ছিল। প্রাচীনকাল থেকেই শাল, মহূয়া, পলাশ, অন্যান্য বিশাল বৃক্ষরাজি ও উরি পাহাড় দ্বারা 'জঙ্গলমহল' আবৃত ছিল।[১] এর বৃহৎ অংশের ভূখণ্ড রুক্ষ ও অনুর্ব্বর। এই অঞ্চলের নিম্নে স্ফটিকযুক্ত পাথুরের চাদর বিস্তৃত রয়েছে। প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এই অঞ্চলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জঙ্গলমহলে রয়েছে শুশুনিয়া, রাজমহল, দলমা, অযোধ্যা, জয়চণ্ডী, যাবর, সিমনি প্রভূতি উল্লেখযোগ্য পাহাড়। উর্বর ও চাষযোগ্য কৃষি জমির স্বল্পতা ও জলসংকট এই অঞ্চলের স্বল্প-জনবিন্যাসের অন্যতম কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

যীশুখ্রিস্টের জন্মের বহু পূর্বে "তরাই জঙ্গলমহলে" সাঁওতাল, মুন্ডা, বীরহর, ভূমিজ, খেরিয়া-শবর, কোল, ভিল, নাট প্রমুখ আদিম জনজাতির মানুষ বসবাস করছে। পরবর্তীকালে তারা ঔপনিবেশিক শোষণ-নিপীড়কে উপেক্ষা ও প্রতিবাদ করে নিজ জাতির মাতৃভূমির স্বাধীনতা বারংবার বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। বাংলার সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে এতদ অঞ্চলে আদিম জনজাতির মানুষ ঔপনিবেশিক শাসক এবং তাঁদের অনুসারী জমিদার, মহাজন ও পুলিশি শক্তির বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ বিদ্রোহ ও আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন তা আধুনিক ভারতের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। মূলত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 'ধ্বংসাত্মক অর্থনীতি' ও স্বার্থান্বেষী ভূমি বন্দোবস্ত' উভয়ের অদম্য আঘাতে সহজ সরল আদিবাসি শ্রেণীর দুঃখ দুর্দশা অবর্ণনীয় হয়ে উঠেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শেষের দিকে বাংলা তথা জঙ্গলমহলের অর্থনীতি ও ভূমি সঙ্কটের তীব্র চ্যালেঞ্জের সন্মুক্ষীন হয়েছিল হতদরিদ্র আদিবাসি শ্রেণির মানুষ। দিশেহারা ও শান্ত জনজাতির ভূখণ্ডে ক্রমশই বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত হয়েছিল[২] ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট থেকে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা প্রদানের বিনিময়ে দেওয়ানি লাভ করেছিল। দেওয়ানি লাভের

পরেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একমাত্র লক্ষ্য ছিল চুক্তি ও আইনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ পরিমাণে রাজস্ব বৃদ্ধি করা। এই পর্বে কোম্পানির পরিচালক গোষ্ঠী জমিকে খণ্ডিত করে, অনাবাদী জমিকে আবাদী করে, বনাঞ্চলকে খণ্ডিত করে, নদী ও সমুদ্র তীরবর্তী ও বন্যা প্লাবিত সমতল ভূমিকে রাজস্বের আওতাধীন করে, কোম্পানি তাঁদের অর্থনৈতিক লালসাকে পরিপূর্ণ করতে চেয়েছিল। রুক্ষ ও অনুবর জঙ্গলমহলের হতদরিদ্র আদিবাসি গোষ্ঠীগুলিকে পরিকল্পিতভাবে নিষ্পেষিত করেছিল। এছাড়াও কোম্পানি রেলপথ নির্মাণের মাধ্যমে আদিবাসি শ্রেণীর জীবন জীবিকার উৎসস্থল অরণ্যভূমিকে সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধনের এক অদ্ভুত পরিকল্পনা করেছিল- একথা বলা যেতে পারে। ফলে এই অঞ্চলে শুস্কতা বৃদ্ধি পায়, নানা রোগের উদ্ভব ঘটে, বিভিন্ন বনঔষধির অবলুপ্তি ঘটে। সমাজের মূল স্রোত থেকে বহুদূরে বসবাসকারি আদিবাসি শ্রেণির স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, অর্থনীতি ও পরিবেশের স্থিতিশীলতার অবনমন ঘটে। আর্থ-সামাজিক সংকট তাঁদেরকে তীর, ধনুক, বল্লম ইত্যাদি নিয়ে বর্বর স্বৈরাচারী শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধ্য করে।[৩] Ram Chandra Guha in his article and subsequently in his book assesred that in the pre-British period, there was little or no interference with the customary use of forest and forest produced in opposition to the argument propounded by Gadgil and Guha that Imperial needs for timber and ship building propelled scientific forestry with its Associated bureaquracy.

মূলত ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে যে পালাবদল ঘটেছিল তার অন্তরেই জঙ্গলমহলের ব্রিটিশ বিরোধী ইতিহাসের মূল কার্যকরণ সূত্র নিহিত আছে। ১৭৫৭ সালের পূর্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকগণ মুর্শিদাবাদে কাশিমবাজারের স্থানীয় রেশম শিল্পীদের নিকট থেকে দাদন নিয়ে ব্যবসা করতেন। গবেষক সুশীল চৌধুরী "নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদ" গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, মুর্শিদাবাদ-কাশিমবাজারের কাঁচা রেশমের বাজারে দেশীয়-ভারতীয় ব্যবসায়ীদের এতটাই দাপট ছিল যে, তাঁদের কেনাকাটার ওপরেই বাজারের দাম ওঠা নামা নির্ভর করত, ইউরোপীয় বণিকরা এই বাজারে প্রায় নীরব দর্শক হয়েই থাকত। ১৭৭৩ সালে কাশিম বাজারের ইংরেজ কুঠি জানায় যে, কাঁচা রেশমের দাম নির্ভর করেছে এশীয় ভারতীয় বণিকদের চাহিদার ওপরেও এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা তাঁদের ক্ষমতার বাইরে। এর ১১ বছর পরেও (১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে) অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। কোম্পানির কাশিমবাজার কাউন্সিল কলকাতায় এক পত্র দ্বারা জানায় যে, কাঁচা রেশমের দাম অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ অসহায়। কারণ কাঁচা রেশমের বাজার নিয়ন্ত্রণ করা তাঁদের সাধ্যাতিত। কিন্তু পরবর্তীকালে এই ইংরেজ বণিক গোষ্ঠী বাংলার তিন চাকলার যথা- বর্ধমান, মেদিনিপুর ও চট্টগ্রামের কৃষকদের অগ্রিম দাদন নিতে বাধ্য করে। এইভাবে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরুপে দেখা দিল। এই প্রেক্ষাপটে জঙ্গলমহলে বিদ্রোহ ও বিক্ষোপের নানা পর্যায়গুলি বিচার বিশ্লেষণ ও অলোচনা করার পূর্বে, জঙ্গলমহলে প্রাক-ঔপনিবশিক সমাজ, অর্থনীতি, প্রশাসন ও রাজস্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা না করলে আলোচ্য বিষয়ের মূল ঐতিহাসিক চিন্তাভাবনার বৃত্ত অসম্পূর্ণ থাকবে।

প্রাক-ঔপনিবশিক জঙ্গলমহল:- ১৭৫৭ সালের পূর্বে জঙ্গলমহলে সম্পূর্ণ পৃথক আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক কাঠামোরে অস্তিত্ব ছিল। স্থানীয় রাজা মহারাজা বা সামন্তপ্রভুগণ আদিম জনজাতিদের নিয়ে 'গণ মিলিশিয়া' সৈন্যবাহিনী গঠন করেছিল। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় শান্তি শৃঙ্খলা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকা তথা সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা। আকবরের শাসনকালে সুবে বাংলার ৩৪টি পরগণা ছিল এবং সেখান থেকে মোঘল সম্রাট রাজস্ব আদায় করত। মুর্শিদকুলি খাঁর শাসনকালে বাংলার সুবাকে ১৭টি চাকলাতে বিভক্ত করা হয়। চাকলার শাসকগণ 'চাকলাদার' নামে পরিচিত ছিল। চাকলাদারগণ ইজারাদারদের নিযুক্ত করে রাজস্ব আদায় করত। পরবর্তীকালে জমিদারগণ বাংলার কৃষি, কৃষক ও কৃষক সমাজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রা হিসাবে আবির্ভূত হয়।

প্রাক-ঔপনিবশিককালে 'ফুল কুসুমা' নামক এলাকাটি মেদিনিপুর চাকলার অন্তর্গত ছিল। এছাড়া রায়পুর, পাবনা, অম্বিকানগর, মানভূম, পারা ঘাটশিলা, ধলভূম ইত্যাদি অঞ্চল গুলি বর্ধমান ও মেদিনীপুর চাকলার অন্তর্গত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর ষাটের দশক পর্যন্ত সমগ্র বাংলা নবাবের শাসনাধিন ছিল।[৫] ১৭৬৫ থেকে ১৭৭০ সালের মধ্যে বাংলার শাসন আইন ও রাজস্বের অধিকার কোম্পানির নিয়ন্ত্রাধীন হয়। ইতিপূর্বে কিন্তু জঙ্গল মহলের সমাজ ব্যবস্থায় মুখিয়া,মন্ডল, প্রধান, মাঝি, ঘাটোয়াল প্রভৃতিদের প্রাধান্য ছিল। তাঁরা আদিবাসীদের নিয়ে নিজ নিজ সৈন্য বাহিনী গঠন করত এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে শান্তি শৃক্ষলা বজায় রাখত। সরকারি দলিল দস্তাবেস্ত প্রতিবেদন অনুসারে বলা হয় যে, স্থানীয় প্রবীণদের ক্ষমতা ধ্বংস করে কোম্পানি নিজ রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির ষড়জন্তে লিপ্ত ছিল।[৬] Bengal Districts Record Midnapore, ১৭৬৩ থেকে ১৭৬৭ জানা যায় যে, On 13th January, 1767, John Graham, the Resident of Midnapore,wrote a Letter to John Furguson in which he refered to the powerful and very large tract of the Country lying westward of Midnapore, with a view to bring these Independent Zamindars to obedience and to reduce them to a proper subjection to the Company of just Revenue John Graham Directed Ferguson to carry Arms against them."[৭] এই প্রতিবেদনের মূল মর্মার্থ হল - জঙ্গল মহলের জমিদারগণদের কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে এনে তাদেরকে সরকারি রাজস্ব দিতে বাধ্য করা। কেউ প্রতিবাদ করলে তার বিরুদ্ধে সাময়িক অভিযান প্রেরণ করে তাকে পরাস্ত করা। ১৭৬৭ সালে কোম্পানি কর্ণগড়ের রানী শিরোমণি পাইক ও সর্দারদের সাহায্য নিয়ে অন্যান্য বিদ্রোহী জমিদারগণকে পরাস্ত করেছিল। A. K. Jemhson এর প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, "...... The Liutenant Ferguson emplo-ed in his expedition against the Jangal Rajas were supplied from Midnapore Esate of Rani Siromoni that these Retainers were not paid a 'Pesh kesh' quite Rent."[৮] এই ভাবে কোম্পানির ক্ষমতা ও ভূমি দখলের মানসিকতার বিরুদ্ধে জঙ্গল মহলে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত করে।

মণ্ডলী প্রথা:- প্রাক ঔপনিবশিককালে বিস্তৃত জঙ্গল মহলের ভূসম্পত্তি নানা উপজাতি ও প্রাচীন দেশীয় উপজাতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বণ্ঠিত ছিল। তাদের মধ্যে অবশ্য মালিকানার প্রথা প্রচলিত ছিল। উপজাতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রথা চালু ছিল। দলপতিদের মাধ্যমে মহলগুলির সংগৃহীত রাজস্ব জমিদারের রাজস্ব খাতে জমা হত। এই রীতি সাধারণ ভাবে মণ্ডল বা মণ্ডলী রাজস্ব প্রথা নামে খ্যাত ছিল। এই ব্যবস্থায় গ্রামবাসীগণ মণ্ডলের সীমানা নির্ধারণ করতেন। মণ্ডলের জোতদারগণ রাজস্ব সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট রাজস্বের পরিমাণ, নির্দিষ্ট সময়ে সংশ্লিষ্ট জমিদারকে প্রদান করতে

ছিলেন। মণ্ডলপতি মণ্ডলের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সদা তৎপর ছিলেন। জঙ্গলমহলের অনাবাদী, পতিত ও অরণ্য পরিস্কার করে তাকে চাষযোগ্য করে নতুন গ্রাম পত্তন করা হত। এই পত্তনের যাবতীয় দায়িত্ব জমিদারই বহন করত এবং নতুন বসতির আবাদ কর জমিদারের প্রাপ্য ছিল। এইভাবে জনশূন্য অনাবাদী অঞ্চলে গ্রামের পত্তন যেমন হয়েছিল তেমনি এর নামকরণ জমিদারই করত। মণ্ডলের রায়ত ও জমিদারের মধ্যে বোঝাপড়ার সম্পর্ক ছিল। মণ্ডল নির্বাচনে ও গ্রামের উন্নতি, ব্যবসা বাণিজ্য, মন্দির স্থাপন ও পরিচালনা ধর্মীয় রীতি নীতি ও উৎসব পালন, সামাজিক রীতি নীতি উৎযাপন প্রভূতির ক্ষেত্রে মণ্ডলে প্রবীণ ব্যক্তির কতৃত্ব থাকলেও জমিদার ছিলেন মণ্ডলের সর্বময় কর্তা।[৯]

চাষ জোত প্রথা:- মণ্ডল প্রধান জমিদারদের অনুমতি স্বাপেক্ষে মণ্ডলী ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করতেন। Law Report Commission-1817 অনুসারে মানভূম, সিংভূম, ধলভূম, মল্লভূম, বরাভূম ইত্যাদি অঞ্চলের 'চাষ জোত' প্রথার প্রচলন ছিল। এই প্রথার নানা স্তর বিন্যাস ছিল। ঐতিহাসিক Nicholas B. Dirks তাঁর বিখ্যাত "Caste of Mind" গ্রন্থে মানভূমের এই ভূমি বন্দোবস্তকে 'Kolarian o Dravidian" ভূমি ব্যবস্থার সমন্বয়ী রুপ হিসাবে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, বন জঙ্গল কেটে নতুন গ্রাম পত্তন ও তাঁর পরিচালনা গ্রাম প্রধানরাই বংশানুক্রমিক ভাবে পরিচালনা করতেন। পরবর্তীকালে বহিরাগত দ্রাবিড়গণ কোলারিয়ান ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস না করে, উভয় পদ্ধতির মিলন ঘটিয়ে 'চাষ জোত' নামক পদ্ধতির প্রচলন করেন। Nicholas B. Dirks এর গ্রন্থ থেকে জানা যায়, তৎকালীন ব্রিটিশ ভূমি বিশেষজ্ঞ B.H. Baden Powel এই ব্যবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, "Originaly its seemed that a lot was Reserved for the old tribe Manjhi and his called 'Majhhas; the Bhuinhar of the original families of the village Head their Allotments ....The Allotment for the Laboures who cultivated the Ro–al farm and their Allotment ware Held Revenue Free'"[১০]

পাইকান সম্পত্তি:- প্রাক-ঔপনিবেশিক শাসনাকালে বাংলা তথা জঙ্গল মহলের তালুকগুলিতে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ও বহিঃ শত্রুর আক্রমণ মোকাবিলা করা, রাজস্ব আদায় প্রভূতি ক্ষেত্রে পাইকানদের শারীরিক শক্তিকে গুরুত্ব দিয়ে তাঁদেরকে সেনা বাহিনীর কাছে লাগানো হতো। বিনিময়ে তাদের বিনা খাজনায় বা পেশকেশ' নামে জায়গীর ভোগ করার অধিকারী হতেন। Jemhson এর "Survey and Settlement Report" এ উল্লেখ আছে যে, "To the Jungle Rajas as to the border- chieftains in all times and in all countries fighting was the normal state of Existence was mere interlude. Even it any of them was not by nature himself of a predatory de position, he could't record a similar mildness at his next door neighbour and has to be readz at amoments Notice to turn out and Defend his properly and Lives of the Depandants................ A nominal rent."[১১]

জঙ্গলমহলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সামন্তপ্রভুদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ নিত্যদিনের ঘটনা ছিল। যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত সেই যোদ্ধাদের পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ করমুক্ত যে জমি দান করা হত তা "পাইকান জমি" নামে পরিচিত। ১৭৮৬ সালে Mr. Grant রচিত "Analysis and Finance in Bengal" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, মেদিনীপুর ও জলেশ্বর চাকলার জমিদারদের অধীনস্থ পাইকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৮,৯৭৫ জন এবং তাদের অধিকারভুক্ত জমির পরিমাণ ছিল ১,৪৮,৫৯১ বিঘা।[১২]

ঘাটোয়ালি প্রথা:- দীর্ঘকাল ধরে জঙ্গলমহলের নানা মহল্যায় বা তালুকের 'ঘাটোয়ালি প্রথা' প্রচলিত ছিল। বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজারা মারাঠা আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ঘাটোয়ালি প্রথা প্রবর্তন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা বীরহাম্বীর এই প্রথা প্রবর্তন করেন। তিনি ঘাটোয়ালি সম্প্রদায়কে মল্ল সৈন্যবাহিনী গঠন করার জন্য তাদেরকে নিয়োগ করেছিলেন। তাদের ক্ষত্রিয় শৌর্যবীর্যের কারণে তারা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ঘাটোয়ালি সামরিক কর্মচারীগণ 'পঞ্চকি' নামে করমুক্ত জমি ভোগ করতেন। স্যার চার্লস গ্রান্ট এর তথ্য অনুযায়ী, মল্ল রাজাদের সৈন্যবিভাগের ২,২৯৯ জন ঘাটোয়ালি নিযুক্ত ছিলেন এবং তাদের জন্য করমুক্ত জমির পরিমাণ ছিল ৩৫,২৮৩ বিঘা। যে সমস্ত ঘাটোয়ালি অধিকারভুক্ত জমি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে অন্য রাজ্যাধিপতির আওতাভুক্ত হত, সেই ঘাটোয়ালি করমুক্ত ভূখণ্ডকে 'পক্ষাকি ঘাট' নামে অভিহিত করা হতো। এই ভূখণ্ডের সংশ্লিষ্ট রাজা বা জমিদার কর আদায় করতে পারবেন না।

ছোটনাগপুরের অন্তগত সিংভূম, হাজারীবাগ, লোহারদাগা ও মলভূম জেলায় এই ঘাটোয়ালি প্রথা প্রবর্তিত ছিল। ১৮৭৯ সালে Bengal Act প্রবর্তিত হওয়ার পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিভিন্ন তালুক বা মহলের সামন্তগনকে সংশ্লিষ্ট ভূখন্ডের মালিক রুপে স্বীকৃতি দিলে এই প্রথার অবসান ঘটে।

ব্রিটিশ ভূমি বন্দোবস্ত:- ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি ভূমির ক্ষেত্রে নিত্যনতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। তারা একশালা ও পাঁচশালা বন্দোবস্ত ব্যর্থতার পর লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ সালের ভূমি বন্দোবস্ত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র পরিণত করে, যা ইতিহাসে "Permanent Settlement" নামে খ্যাত।[১২]

১৮১৯-১৮২০ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা তথা ভারতে বিভিন্ন প্রান্তে জমির উর্বরতা ওপর ভিত্তি করে, মহল্লা বা তালুকের অধিপতি আবার কখনও কৃষকের সঙ্গে নানা চুক্তি সম্পাদন করে নিত্যনতুন রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করলে দেশে ধনী থেকে গরীব সকল স্তরের মানুষ অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হয়। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির জঙ্গলমহলে পত্তনি আইন ও অন্যান্য আইনের দ্বারা দেশীয় ভূমি বন্দোবস্ত বাতিল বলে ঘোষণা করে। ফলে জঙ্গলমহলে ভূমিকেন্দ্রিক আর্থ-সামাজিক স্থিতিশীলতার সম্পূর্ণ অবসান ঘটে। কোম্পানি অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের স্বার্থে তার অনুগতশীল একটি শ্রেণী তৈরি করে। জমিদার, ইজারাদার, পত্তনিদার, দরপত্তনিদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগী দল সমগ্র বাংলা তথা জঙ্গলমহলে যে অত্যাচার ও শোষণের নারকীয় কুশাসনের সূচনা করেছিল তার ফলে 'মণ্ডলী', 'মাঝি', 'ঘাটোয়ালি', 'পাইকান' ও সমাজের অন্যান্য স্তরের মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। সেই সঙ্গে প্রাক-ব্রিটিশ যুগের ভূমির প্রথার অবসান ঘটে। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দেশীয় শান্তির স্থলে বিদেশি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন কার্যকরী করার মধ্যে জঙ্গলমহলের আদিবাসীদের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, বিদ্রোহ ও আন্দোলন গড়ে ওঠার কারণগুলি নিহিত আছে।[১৪]

চুয়াড় বিদ্রোহ:- অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহাজনি কারবার, ব্যবসায়ি শ্রেণীর একচেটিয়া

আধিপত্য ও শোষণ কৃষকদের উপর সামন্তদের নিপীড়ন, শ্রমিক শ্রেণীর আর্থিক দুর্দশা ও বেকারত্ব ইত্যাদির ফলে দেশের সম্পদ উৎপাদনকারি শ্রেণি সব থেকে বেশী শোষিত ও নিপীড়িত হয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নতুন শাসনতন্ত্রে জঙ্গল মহলের ঘাটোয়াল, তরফদার, পত্তনিদার, পাইকান ইত্যাদি শ্রেণির পাশাপাশি আদিবাসী সম্প্রদায় মর্যাদা ও সহায় সম্বলহীন হয়ে তাদের অসন্তোষের আগুন সমগ্র জঙ্গলমহলে মন্থর গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। কোম্পানি জঙ্গল মহলে অশান্ত পরিস্থিতি বিচার করে বিভিন্ন অঞ্চলে সৈন্য মোতায়েন করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় জমিদারগনকে জোরপূর্বক রাজস্ব প্রদানে বাধ্য করা এবং তাদের দুর্গগুলি সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করা।[১৫] ১৭৬৭ সালে কোম্পানির এই ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হলে চুয়াড় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। তৎকালীন মেদিনীপুরের রেসিডেন্ট গ্রাহাম সাহেবের নির্দেশে লেফটেন্যান্ট ফারগুসন একদল সৈন্য বাহিনী নিয়ে রামগড়, লালগড়, জামবানি, শীলদার, বেলদা প্রভৃতি মহলের জমিদারগণকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করে। শুধু তাই নয়, ইংরেজ সেনাপতি ব্যারেজ সিংভূম, মালভূম ও মল্লভূম অঞ্চলের সীমান্তবর্তী রাজন্যবর্গকে কোম্পানির নিকট পরাজয়ের স্বীকার করতে বাধ্য করে। যদিও ১৭৭০ সালে ঘাটশিলার রাজা ব্রিটিশ বিরোধী আক্রমণে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলে।[১৬]

উপরিউক্ত বিদ্রোহগুলিতে চুয়াড়গণের বিষাক্ত তীরে বহু ইংরেজ সৈন্য যুদ্ধস্থলেই মারা যায়। যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন যে, ঘাটশিলার জমিদার অত্যন্ত বীর বিক্রমে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। যদিও বৃদ্ধ জমিদার পরাস্ত হয়েছিল ও জগন্নাথ ধল ঘাটশিলার রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে হিগিন্স সাহেব ঘাটশিলা "মোকবাড়ি ভূমি বন্দোবস্ত" চালু করেন।[১৭] এর ফলে কৃষক, জমিদার ও আদিবাসীদের শোষণ নিপীড়ন আরও বৃদ্ধি পায়। জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে বৈরিতার সম্পর্ক তৈরি হলেও ইংরেজ সরকার ছিল অত্যাচারী ও শোষণকারি। রণবীর সমাদ্দার "Memory, Identity, Power Politics in the Jungle Mahal: 1890-1950" গ্রন্থে চুয়াড়দের লড়াই ও বীরত্ব সম্পর্কে বলেছেন যে, "এই মাটির চুয়াড়, টাঙ্গি ও বল্লম নিয়ে লড়াই করেছিল, রক্ত দিয়েছিল মাথা নত না করে ইংরেজদের আক্রমণ মেনে নেয়নি।[১৮]

১৭৯৮-৯৯ সালে চুয়াড় বিদ্রোহ ভয়ঙ্কর রুপ পরিগ্রহ করে। মূলত চুয়াড়দেড় জমির অধিকার বিলোপ ও অতিরিক্ত রাজস্ব বৃদ্ধি এই বিদ্রোহের প্রধান কারণ। চুয়াড়দের দখলীকৃত জমি ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জোড়পূর্বক দখল করলেও এই বিদ্রোহে পাইকরাও যোগদান করে। ফলে তাদের আন্দোলনের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পায়। তারা প্রবীণ সেরেস্তেদার, রসিকলাল ঘোষ হত্যা করে। কিন্তু ১৭৯৯ সালে ১৫ই ডিসেম্বর চুয়াড় বিদ্রোহ ক্রমশই স্থিমিত হয়ে পড়ে।

১৭৯৪ সালে এই বিদ্রোহ পাত্রাহাতু থেকে ক্রমশ বড়ু তামার, পঞ্চকোট ও বরাভূমে ছড়িয়ে পড়ে। বাঘমুন্ডির জমিদারের নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে কোম্পানি অস্থায়ীভাবে সেখানকার জমিদারিত্ব বেআইনি ঘোষণা করে। অন্যদিকে ঝালদা, পারগা ও পঞ্চকোট জমিদার রাজস্ব প্রদানে ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে মাধা জমিদারি দখল নিয়ে পঞ্চকোট রাজ্যের সাথে কোম্পানির বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকার পঞ্চকোট জমিদারিত্বকে নিলামে তোলে। পঞ্চকোট রাজ কোম্পানির এই নিলামকে বেআইনি বলে ঘোষণা করে বিদ্রোহ করে। এইসময় পঞ্চকট রাজ ভূমিজ প্রজাদের একত্রিত করেন এবং বিক্ষুব্ধ জমিদাররা তার সঙ্গে একত্রিত হলে ইংরেজদের দর্প চূর্ণ হয়।[১৯] এইভাবে রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত কারণে চুয়াড় বিদ্রোহ ঝালদা, মানভূম, চাষ, বরাভূম, সুপুর, অম্বিকানগর ইত্যাদি অঞ্চলে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে।

১৭৯৭-৯৮ খ্রিস্টাব্দে চুয়াড় বিদ্রোহ মানভূম, ধলভূম ও মল্লভূম হয়ে কর্ণগড় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এই বিদ্রোহের প্রধান নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রায়পুরে জমিদার দুর্জন সিংহ। তিনি বিদ্রোহীদের সঙ্ঘবদ্ধ করে প্রতিশোধের আগুন সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়। বিদ্রোহীরা রায়পুরের তহশীলদারকে খাদ্য সরবরাহের জন্য আদেশ দিলে তিনি প্রাণভয়ে রায়পুর ত্যাগ করেন। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে দুর্জন সিংহ তার অনুচরদের নিয়ে রায়পুর পরগনায় ৩০টি গ্রামের উপর নিজের আধিপত্য স্থাপন করেন। তাছাড়া, তিনি জমিদারদের সমর্থন প্রজাদের উপর আক্রমণ শুরু করে বহু প্রজা অন্যত্র পলায়ন করে। ফলে চুয়াড়রা তাদের জমি জায়গা ঘর বাড়ি দখল করে নেয়। মে মাসে দুর্জন সিংহ সৈন্য বাহিনী রায়পুরের জমিদারের কাছাড়ের বাড়িতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করলে কোম্পানির সৈন্যদলের সঙ্গে বিদ্রোহীদের তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়। অন্যদিকে জনৈক গবরধন দিকপাতির নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা আনন্দপুর গ্রামকে লুণ্ঠন করে। এই বিদ্রোহ মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে দুর্জন সিংহকে তারা বন্দী করলেও উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।[২০]

এই বিদ্রোহ দমনে ইংরেজরা বার বার ব্যর্থ হয়। তারা নিজেদের ত্রুটি বিচ্যুতির অপেক্ষা দেশীয় জমিদারগণকে এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী করে। কারণ কোম্পানি মনে করত এই বিদ্রোহের পশ্চাতে জমিদারদের প্রচ্ছন্ন সমর্থন আছে। এই সন্দেহের কারণে তারা রানী শিরোমণিকে বন্দি করে কলকাতার বিচারে জন্য নিয়ে আসে, পরে রাণী নির্দোষ প্রমাণিত হলে তাকে মেদিনীপুরের ফিরিয়ে আনা হয়।[২১] ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ এই বিদ্রোহের তীব্রতা হ্রাস পেলেও জঙ্গলমহলের নানা প্রান্তে চুয়াড় বিদ্রোহ তুষের আগুনের মত সংক্রিয় ছিল।

এই বিদ্রোহের ফলে কোম্পানির 'বিক্রয় আইন', 'কালেক্টরেট আইন', 'ক্রেতা আইন' ইত্যাদি পরিবর্তিত হয়। শুধু তাই নয়, রাজস্ব অনাদায়ে জমিদারি নিলামের আইনটি অবলুপ্তির দাবি জানানো হয়। এই ভাবে মানভূম, ধলভূম, বরাভূম ও রায়পুরে চুয়াড়দের বিদ্রোহ কোম্পানির নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জমিদারদের সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য হয়। এই বিদ্রোহের ফলে জমিদারি নিলামি ব্যবস্থার অবসান, জঙ্গলমহলের জেলা গঠন, ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি স্বাপেক্ষে জমিদারদের নিজ নিজ অঞ্চলে দ্বারকা, পাইক ও সর্দারদের নিয়োগ করার স্বাধীনতা, জঙ্গল মহলে পৃথক আইনের ব্যবস্থা, পাইকান প্রথার পুনরুত্থান ইত্যাদির স্বাধীনতা উপজাতিগণ অর্জন করে নেয় নিজ বিদ্রোহের শক্তিতে।[২২]

সাঁওতাল বিদ্রোহ:- উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সংঘটিত অন্যতম রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হিসেবে সাঁওতাল বিদ্রোহকে বিবেচিত করা যেতে পারে। এই বিদ্রোহের পশ্চাতে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, পরিবেশ ও গুজবের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলায় ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দেশীয় জনগোষ্ঠীর ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার চক্রান্ত করেছিল। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ব্রিটিশ প্রশাসন আদিবাসীদের সমাজের মূল স্রোতে বিচ্ছিন্নতা কোম্পানি ঘটিয়ে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে

ঔপনিবেশিক শাসনের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার চক্রান্ত করেছিল। পরবর্তীকালে সাবেকি ভূমি বন্দোবস্ত স্থলে উপনিবেশিক ভূমি বন্দোবস্তর ও রাজনীতি জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই পর্বে আদিবাসী সমাজে জমিদার, মহাজন, ব্যবসাদার ও ঠিকাদার সাঁওতাল পরগনা অঞ্চলে বিদ্রোহের পটভূমি তৈরি হয়। এই অঞ্চল বহিরাগত বা দিকুরা নিরীহ আদিবাসীদের নানা কৌশলে ঋণজালে আবদ্ধ করে তাদের সর্বস্বান্ত করে, অপরদিকে ব্রিটিশ অনুগত জমিদারগণ তাদেরকে জমি ও বাস্তু থেকে উৎখাত করে তাদেরকে নিজ ভূমে পরবাসী করে তোলে। সেইসঙ্গে বনাঞ্চলের ধ্বংস সাধন ও তার ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি, শুষ্কতা বৃদ্ধি, পরিযায়ী শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, পুলিশের অত্যাচার, নারী নির্যাতনের ঘটনা, বেনিয়া শ্রেণির শোষণ-নিপীড়ন ইত্যাদি আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও পরিবেশ সংক্রান্ত কারণগুলি সাঁওতাল বিদ্রোহকে অনিবার্য করে তুলেছিল।

ইংরেজ শাসন নীতি ও জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ীদের অকথ্য উৎপীড়ন আদিবাসীদের জীবনে এক ভয়ঙ্কর ত্রাসের সঞ্চার করে। এই অন্যায় অত্যাচার, অন্যায়-অবিচার ও নিজ জাতি সম্প্রদায়ের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সকল সাঁওতাল আদিবাসীগণ সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরবের নেতৃত্বে বিদ্রোহের পথে অগ্রসর হয়েছিল। আদিবাসী সাঁওতাল বিদ্রোহকে গণ অভ্যুত্থান হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সিধু ও কানুর ধর্মীয় জাগরণের নিসচিব তুলে এই বিদ্রোহকে সর্বাত্মক করতে চেয়েছিল। তারা পবিত্র শাল গাছের ডাল (গীরা) প্রতিটি গ্রামে প্রেরণ করে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই পবিত্র ধর্মীয় আহবানে সাড়া দিয়ে প্রায় ১০,০০০ সাঁওতাল আদিবাসীবৃন্দ ভাগনাডিহি গ্রামের বট বৃক্ষের নিচে শামিল হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ম্যাকফেল সাহেব লিখেছেন, "কেবলমাত্র দামিন-ই-কোহ থেকে নয়, বীরভূম, ভাগলপুর, হাজারীবাগ, মানভূম ইত্যাদি অঞ্চল থেকে হাজার হাজার সাঁওতাল সিধু, কানুর আহবানে সাড়া দিয়েছিলেন। এরপর ১৮৫৫ সালে ৩০শে জুন হাজার হাজার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ ভাগনাডিহি থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে অভিযান শুরু করে। W. W. Hunter এর মতে, এই অভিযানের কেবলমাত্র নেতৃবৃন্দের সঙ্গে প্রায় ৩০০০০ সাঁওতাল জনগণ তাদের সঙ্গে দেহরক্ষী হিসেবে অভিযান করেছিল। ম্যাকফেল সাহেব এই অভিযানের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এই অভিযানে একমাত্র উদ্দেশ্য হল ঐক্যবদ্ধভাবে কলকাতায় গিয়ে গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসির নিকট সাহায্যের আবেদন করা।[২৪] ভারতবর্ষের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে বোধ হয় এই প্রথম 'গণ পদযাত্রা' ছিল। অবশ্যই এই 'গণজাগরণ' ও 'গণ পদযাত্রা' জঙ্গলমহলের আদিবাসীদের ইতিহাসকে মহামান্বিত করে তুলেছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার পেশীশক্তি ও আধুনিক অস্ত্রের দ্বারা হাজার হাজার সাঁওতাল কৃসক ও শ্রমিককে ভূমিহীন, বাস্তহারা করেছিল, তাদের অর্থনীতি জীবনজীবিকাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত করেছিল। সিধু, কানু ও তাদের অনুসারী হাজার হাজার সাঁওতাল কৃষক নিয়ে নিজ ভূমে বেঁচে থাকার চেয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন কোম্পানি নিকট, কিন্তু সরকার তার বিনিময়ে তাদেরকে ছিন্নমূল মানুষে পরিণত করেছিল। এই বিদ্রোহ ছিল তার বিদ্রোহের গণপ্রতিরোধ।

বস্তুতপক্ষে কলকাতা অভিযানের সময়কালে বিদ্রোহী সাঁওতালগণ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল, সেটাই বোধহয় বাংলার ইতিহাসে "প্রথম সশস্ত্র আন্দোলনের" আত্মপ্রকাশ। অপরদিকে এ আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য কুখ্যাত মহেশ দারোগা সিধু ও কানহুকে গ্রেপ্তার করে। দারোগা তাঁর উদ্দেশ্য গোপন করিলেও বিদ্রোহীরা তাহা বুঝিতে পারে। নির্বোধ দারোগা তাহার অনুচরদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেয়। কিন্তু দারোগার শেষ হওয়া মাত্র ঐ স্থানে সমবেত সাঁওতালগণ দারোগাকে বাঁধিয়া, বিচার করিয়া সিধু নিজ হস্তে দুনীতি পরায়ণ দারোগাকে হত্যা করে। তখনই সাঁওতাল বিদ্রোহীগণ উন্মুক্ত আকাশে তীব্র নিক্ষেপ করে সশস্ত্র আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। ক্ষিপ্ত সাঁওতালগণ সিধু, কানুর চুম্বকীয় নেতৃত্বে মহেশ দারোগাকে হত্যা করে এবং তারপর এই অঞ্চলে জমিদার, মহাজন, সুদখোরদের একে একে হত্যা করে নিজ মাতৃভূমির স্বাধীনতা, পুনরুদ্ধার ও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে। এখানেই তারা ক্ষান্ত হননি, এরপর বিদ্রোহী সাঁওতালগণ বরা বাজার আক্রমণ লুঠ করে মহাজনদের ঘরবাড়ি, নীলকুঠি, রেশন কুটির, শস্য ভান্ডার প্রভৃতি ক্ষেত্রে অগ্নিসংযোগ করে জ্বালিয়ে দেয়। এই বারহের বাজার আক্রমণ করার মধ্য দিয়েই তারা নিজে জাতির 'আত্মমর্যাদা' ও নিজ ভূমে 'আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার' পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। শুধু তাই নয় তারা দলবদ্ধভাবে সিধু কানহুকে অভিবাদন জানিয়ে তাদের নেতৃত্বদ্বয়কে বরণ ও সম্মানিত করে। তারা জানত যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তার আনুগত্য জমিদার শ্রেণীর পক্ষ থেকে প্রতি আক্রমণ ও প্রত্যাঘাত নিশ্চিত। তাই তারা একদল লড়াকু সাঁওতাল বাহিনী গড়ে তোলে ব্রিটিশ প্রত্যাঘাতের মোকাবিলা করার জন্য। সাঁওতাল নেতৃবৃন্দ গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলে 'গীর' বা শাল গাছ পাঠিয়ে সাঁওতালদেরকে এই বিদ্রোহে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য একান্ত আবেদন জানায়।[২৫] সিধু কানুর নির্দেশে এই বিদ্রোহের কর্মীবৃন্দ গান রচনা করে গ্রামবাসীকে অনুপ্রাণিত করার প্রয়াস চালায়। ধূমায়িত এই বিদ্রোহের খবর পাওয়া মাত্রই ভাগলপুরের কমিশনার সি.এফ. ব্রাউন এই অঞ্চলে ভারপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার H.W. Barrows কে অবিলম্বে ভাগলপুর ও রাজমহলের অশান্ত পরিবেশ শান্ত করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু ব্যারেজ রাজমহলের পথ হয়ে কাল্লা অঞ্চলে উপস্থিত হলে তিনি সত্য উপলব্ধি করলেন যে, বিশাল সাঁওতাল বাহিনী প্রতিহত করা একেবারেই অসম্ভব। তাই তিনি অধিক সৈন্য প্রেরণ করার জন্য গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসিকে এক পত্র প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহ দাবানলের মতো নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিদ্রোহের সংখ্যাও ক্রমশ বাড়তে থাকে। এই আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধির ওপর একটি কারণ হলো বাংলা ও বিহারের গরীব দেশীয় মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে এর শক্তি বৃদ্ধি করছিল। এ প্রসঙ্গে হান্টারের উক্তিটি যথার্থ বলে মনে হয়। তিনি লিখেছেন, "সাঁওতাল ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী আদিবাসী শ্রেণি, এমনকি নিম্নবর্গের দরিদ্র হিন্দুরাও সাঁওতাল বিদ্রোহে যোগদান করেছিল"। তাই সুপ্রকাশ রায় তাঁর গবেষণালব্ধ গ্রন্থে বলেছেন যে, "সাঁওতাল বিদ্রোহ কেবলমাত্র সাঁওতালের বিদ্রোহ নয়, অথবা সামান্য একটি স্থানীয় ঘটনাও নয়, এই বিদ্রোহ ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ভারতের পূর্বাঞ্চলের দলিত পিষ্ট দীন মজুর, গরীব চাষি, শ্রমিকশ্রেণী ও কর্মচ্যুত জমিদারদের সম্মিলিত বিদ্রোহ"। এই বিদ্রোহের দ্বারা ইংরেজ সরকার জমিদার ও মহাজন গোষ্ঠীকে সাধারণের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[২৬]

বিদ্রোহের প্রসার:- জঙ্গলমহল ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এই বিদ্রোহের সূত্রপাত হলেও তা অবিলম্বে পাকুর, কালিকাপুর, বল্লভপুর, নবীনপুর এবং শাহবাজপুর, কালিকাপুর, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তারা নীলকর সাহেবদের কাছারি জ্বালিয়ে দেয়। বিদ্রোহীরা বীরভূমের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিশেষ করে নলহনটি, রামপুরহাট, নগর, সিউড়ি, লাংগুলিয়া, গুজরি প্রভৃতি অঞ্চলে ইংরেজ শাসনকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ক্যালকাটা রিভিউ, ১৮৫৫ সালের ২০শে জুলাই এক প্রতিবেদনে জানায় যে, বীরভূমের দক্ষিণ-পশ্চিমে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের অপর ডাল ভাঙ্গা থেকে সাঁইথিয়া এবং ভাগলপুর ও রাজমহল পর্যন্ত বিদ্রোহীদের আধিপত্য অব্যাহত ছিল।[২৭] সমসাময়িক পত্রপত্রিকা থেকে

জানা যায় যে, ইংরেজ তথা তাদের সমর্থনপুষ্ট শ্রেণী আদিবাসী সাঁওতালদের অপর মর্মান্তিক অত্যাচার চালিয়েছিল। এই অত্যাচারের বিভিন্ন ধারা ছিল। ক্যালকাটা রিভিউতে প্রকাশ করা হয়েছিল যে, গোমস্তা সরবরাহিকারি, পিয়ন, মহাজন, পুলিশ রাজস্ব আদায়কারি, আদালতের সরকারি কর্মচারী সকলে একসঙ্গে মিলেমিশে সাঁওতালদের ওপর ভয়ঙ্কর শোষণ, জোর করে সম্পত্তি হস্তান্তর করা, সাঁওতালদের অপমান করা, প্রহার করা ও অন্যান্য নানা উৎপীড়নের জাল বিস্তার করেছিল। এছাড়াও সাঁওতালদের জমির শস্য নষ্ট করা, সাঁওতালকে জোর করে মুচ লেখা লিখিয়ে নেওয়া, ঋণের শর্ত হিসেবে বন্ড লিখিয়ে নেওয়া, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, বেগার শ্রম, স্ত্রী, পুত্র, বালক, বালিকার উপর অত্যাচার ইত্যাদি ঘটনাগুলি সাঁওতাল বিদ্রোহ সৃষ্টির পশ্চাতে শক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আশ্চর্যের বিষয় হলো সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় এই সাঁওতাল বিদ্রোহীদের অসভ্য, বর্বর এবং রাজদ্রোহী বলে সমালোচনা করেছিল।[২৮] এই পত্রিকা ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামকে স্বীকৃতি না দিয়ে তাদেরকে সমালোচনা ও তিরস্কারে বিদ্ধ করেছিল। তথাপি বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ভবানী সেনের কথায়, উনিশ শতকের বাংলায় যে সমস্ত কৃষক সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল তার মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহ বাংলার ইতিহাসের ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। দুঃখের বিষয় হল যে, সাঁওতাল বিদ্রোহের কয়েক বছর পর নীল বিদ্রোহ সংঘটিত হয় এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এই বিদ্রোহের প্রচার-প্রসারে পূর্ণ সমর্থন শক্তি ব্যয় করে। এতদসত্ত্বেও সাঁওতাল বিদ্রোহ নিঃসন্দেহ জঙ্গলমহলে 'প্রথম কৃষক আন্দোলন' ও 'প্রথম গণ সশস্ত্র অভ্যুত্থান' হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে, আঠারোশ সাতান্ন সালের মহাবিদ্রোহ যদি স্বাধীনতা সংগ্রামের মর্যাদা দেওয়া হয় তাহলে সাঁওতাল বিদ্রোহেরও সমমর্যাদা পাওয়া উচিত। সুপ্রকাশ রায়, এই বিদ্রোহের মহাবিদ্রোহ 'অগ্রদূত স্বরূপ' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, "দীর্ঘ দেড় বছর ধরে সাঁওতালরা বাংলা বিহারের কৃষকরা ব্রিটিশ কামান বন্দুককে পরোয়ানা না করে পাঁচটি জেলায় স্বাধীন রাজস্ব কায়েম করেছিল এবং বহু ব্রিটিশ সৈন্য ও জমিদার-মহাজনকে খতম করেছিল। যুদ্ধে পরাস্ত হয়েও আত্মসমর্পণ না করে সমগ্র ভারতের জনগণের সামনে তাঁরা যে পথ নির্দেশ রেখেছেন, সেই পথ ১৮৫৭র মহাবিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজপথে পরিণত হয়ে একবিংশ শতাব্দীর মধ্যে দিয়ে প্রসারিত ভারতবর্ষের কৃষক সেই রাজপথেরই অভিযাত্রী"। অধ্যাপক নরহরি কবিরাজি এই বিদ্রোহকে গণসংগ্রাম বলে আখ্যায়িত করেছেন।

মুন্ডা বিদ্রোহ:- উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে জঙ্গলমহলে অন্যতম আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহ হল মুন্ডা বিদ্রোহ। বিরসা মুন্ডা ১৮৯৯-১৯০০ সালের রাচির দক্ষিণাঞ্চলে উলগুলান (Ulgulan Revolution) বা মুন্ডা বিদ্রোহের সূত্রপাত করেন। 'উলগুলান' শব্দের অর্থ হলো প্রবল বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন। মুন্ডা আদিবাসী শ্রেণী ঐতিহ্যগত ভাবে মুন্ডকাথিয়ার (জঙ্গল পরিষ্কারকারী হিসেবে) নামে পরিচিত। তারা জমির জন্য অপেক্ষাকৃত কম রাজস্ব দিত। কিন্তু উনিশ শতকের মধ্যে মুন্ডাদের জমি বণিক ও জায়গীরদার ও ঠিকাদারদের হাতে কুক্ষিগত হয়ে যায়। তাদের বহু পরিশ্রমে তৈরি করা আবাদি জমি দিকুদের ক্ষমতাধীনে আসার প্রক্রিয়া প্রাক-ব্রিটিশ যুগের শুরু হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা ও সুসংগঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপজাতি অঞ্চলগুলিতে এবং অ-উপজাতীয় বা দিকুদের আগমন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এই সময় থেকে প্রকৃতপক্ষে মুন্ডা নির্যাতনের প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়েছিল। সেইসঙ্গে বলপূর্বক শ্রম আদায়, ঠিকাদারের অমানবিক অত্যাচার এবং লুথারিয়ান ও অংলিকান ও ক্যাথলিক মিশনগুলির ধর্মান্ত রকরণের মানসিক মুন্ডাদের জাতিসত্তাকে গভীর সংকটের সন্মুক্ষীন করে তোলে।[২৯]

মিশনারিদের পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের ফলে আদিবাসী সমাজ অনেক বেশি সাংগঠিত, অধিকার সচেতন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি অর্জন করে। খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার ও প্রসারের ফলশ্রুতি হিসেবে খ্রিস্টান ও অ-খ্রিস্টান মুন্ডাদের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান ও অন্তর্কলহ বৃদ্ধি পায়। এই কারণে তাদের চিরাচরিত জাতিগত ঐক্যবোধের বন্ধন অনেকটা শিথিল হয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিরসা মুন্ডা বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন মুন্ডা আদিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ ও নিজ জাতিকে অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।[৩০]

বিরসা মুন্ডার জীবনে মিশনারী শিক্ষা ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব পড়েছিল। ১৮৯৩-৯৪ সালে তিনি বন বিভাগ কর্তৃক জোর পূর্বক গ্রামের পতিত জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৮৯৫ সালে বিরসা ভগবান দর্শন করে এবং নিজেকে বিভিন্ন রোগ নিয়াময়ের জাদুকরী ক্ষমতা সম্পন্ন একজন অবতার হিসাবে ঘোষণা করেন। তিনি নিজেকে সুকৌশলে দেবত্বে উপনীত করার ফলে হাজার হাজার আদিবাসী মানুষ বিরসার অমৃত বাণী শুনার জন্য ঠাকুর বাড়িতে সমবেত হতেন।[৩১]

তিনি সমবেত জনগণের উদ্দেশ্যে এই বার্তা দিয়েছিলেন যে অবিলম্বে আদিবাসীদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতিনীতি গন্ডী ভেদ করতে হবে। কুসংস্কারমূলক প্রথা বন্ধ করতে হবে। পশুবলি ও মাদক বর্জন ইত্যাদির বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করে তুলেছিল। জাতির শুদ্ধিকরণ করতে চেয়ে ছিলেন। এছাড়া মুন্ডা উপজাতিদের তিনি পবিত্র উপবৃত ধারণ করে এবং পবিত্র নিকুঞ্জে উপাসনা করার প্রাচীন রীতি কে পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। সুতরাং এই আন্দোলনকে এক ধরনের মুন্ডা জাতির অধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনরূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। শুধু তাই নয় তিনি তিনি তার আন্দোলনের মাধ্যমে মুন্ডা সমাজকে বিধর্মীর প্রভাব থেকে মুক্ত করে আদি রূপদান করা ছিল এই আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য। তবে একথা সত্য যে মুন্ডা ভাবাদর্শ ও জীবন দর্শন সৃষ্টিতে যথাক্রমে হিন্দু ও খ্রিস্টান পরিভাষার গভীর প্রভাব ছিল। কিন্তু ধীর গতিতে তার এই ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন রাজনীতি ও ভূমি বিষয়ক উপাদানের অনুপ্রবেশ ঘটে। ১৮৫৮ সালের উপজাতি শ্রেণির কৃষকরা ভিনদেশীয় ভূস্বামী ও বেকার শ্রমের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করেছিল। এটি ছিল মূলত তাদের জমির জন্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনের জন্য লড়াই' যাকে সাধারণভাবে সর্দারি লড়াই' হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে।[৩২]

এই আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে ভগবান বিরসা ধর্মীয় আন্দোলনের গতিপ্রকৃতিকে ভিন্ন রূপদান করেন। প্রাথমিকভাবে বিরসা মুন্ডার সঙ্গে সর্দারি লড়াইয়ের তেমন কোনো তাত্ত্বিক যোগাযোগ না থাকলেও ভগবান বিরসা ক্রমশ জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কারণে সর্দার নেতৃত্ববৃন্দ তার শরণাপন্ন হয়। এর ফলে তিনি সর্দারদের দ্বারা ব্যক্তিগত ভাবে প্রবাহিত হলেও তিনি ছিলেন আদিবাসী কৃষক সমাজের একনিষ্ঠ মুখপাত্র। সর্দারি লড়াইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ ও মহারাজাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, তারপর এই দুই শ্রেণীর মধ্যবর্তী শোষক শ্রেণীগুলিকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা। অন্যদিকে ভগবান বিরসার অভিস্ট লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় ও রাজনীতির স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা। তিনি মনে করতেন জঙ্গল মহলের জমির প্রকৃত মালিক হলো মুন্ডা শ্রেণী এবং তাদের সেই অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। সেই জন্য বিরসা মুন্ডা ব্রিটিশ সরকার ও তার আশ্রিত শোষক

শ্রেণীর বিদায় ঘন্টা বাজিয়ে মুন্ডা রাজ প্রতিষ্ঠার সংকল্পে অটল ছিলেন।

ভগবান বিরসার ক্রমশ জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি, তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বুদ্ধিদীপ্তি নেতৃত্ব, জ্ঞানদীপ্ত ইত্যাদি কারণে ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত ভীত হয়ে তাকে দু'বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। কিন্তু আরও বেশি বাস্তবমুখী ও বিপ্লবী চেতনা নিয়ে জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। এরপর ১৮৯৮-১৮৯৯ সালে গভীর জঙ্গলে একটি বৈপ্লবিক সভা আহ্বান করে মুন্ডাদের দুঃখ দুর্দশা বৃদ্ধিকারী শ্রেণী, যথা- ঠিকাদার, মহারাজা, হাকিম ও খ্রিস্টান মিশনারীদের হত্যা করার জন্য তার অনুসারীদের প্রতি একান্ত আহ্বান জানান। [৩৩]

ভগবান বিরসার নির্দেশ মতোই বিপ্লবীরা থানা, গির্জা, শস্যভান্ডার, সরকারি কর্মকর্তা ও মিশনারীদের ওপর তীব্র আক্রমণ শুরু করে। ১৮৯৯ সালের বড়দিনে প্রাক্কালে মুন্ডা বিদ্রোহীরা রাচি ও সিংভূম জেলার বিভিন্ন থানার এলাকাগুলিতে অগ্নি সংযোগ ঘটায়। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে তারা থানাগুলোতে আক্রমণ করে বিদ্রোহের প্রকৃতিকে জনমত গঠনের প্রয়াস চালায়। ইতিমধ্যে গুজব ছড়ায় যে, ৮ই জানুয়ারি তারা রাঁচি আক্রমণ করবে। এই ভয়ে ব্রিটিশ সৈন্য তাদের সর্বশক্তি নিয়ে বিদ্রোহীদের পরাস্ত ও বিরসা মুন্ডাকে বন্দী করে। বন্দি অবস্থায় ভগবান বিরসার মৃত্যু হয়। এরপর ৩৫০ জন মুন্ডাকে বিচারে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এদের মধ্যে তিনজনের ফাঁসি হয় এবং ৪৪ জন মুন্ডা বিদ্রোহীর দ্বীপান্তরে সাজা হয়। জঙ্গলমহলে মুন্ডা জাতির এই ব্যাপক অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলেও এই বিদ্রোহ ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি হয় অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে। সরকার বাধ্য হয়ে ১৯০২-১৯১০ সালের মধ্যে জমি জরিপ করে মুন্ডাদের দাবিদাওয়া পূরণের চেষ্টা চালায়।[৩৪] ১৯০৮ সালে ব্রিটিশ সরকার 'Nagpore Tenancy Act' পাশ করে তাদের চিরাচরিত খুৎকাঠি অধিকারের স্বীকৃতি দেয়। এই আইনের ফলে বেগার প্রথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়। এইভাবে ছোটনাগপুরের মুন্ডা বিদ্রোহীরা নিজ মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনের যে আশা আকাঙ্ক্ষার নৈতিক ও যৌক্তিক সংগ্রাম গড়ে তুলেছিল তা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মন্থর গতিকে যথেষ্ট পরিমাণে তীব্রতর করেছিল বলেই মনে হয়।

বিদ্রোহের শ্রেণী চরিত্রের চেতনার বিকাশ:- ঔপনিবেশিক আমলে সংগঠিত বিদ্রোহগুলিকে কৃষক আন্দোলন হিসাবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। ঐতিহাসিক ক্যাথলিন গগের মতে, ঔপনিবেশিক সময়কালে উদ্ভূত কৃষক বিদ্রোহগুলির প্রকৃতিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- (১) পুনঃ স্থাপন মূলক বিদ্রোহ, (২) ধর্মীয় আন্দোলন, (৩) সামাজিক আন্দোলন, (৪) সন্ত্রাস মূলক প্রতিশোধ আন্দোলন, (৫) গন অভ্যুত্থান। পরবর্তী কালের নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিকগণ এই কৃষক বিদ্রোহগুলিকে নতুনভাবে দেখার চেষ্টা করেছেন। রণজিৎ গুহ কৃষকদের নিজস্ব রাজনৈতিক চেতনা এবং চেতনার এক বিশেষ কাঠামো আছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এই কাঠামোগুলি হল- (১) নেগেশন, (২) আমবিগুইটি, (৩) ট্রান্সমিশন, (৪)মডারলিটি, (৫) সলিডারিটি, (৬) টেরিটরিয়ালিটি। এই ঘরণার ঐতিহাসিকগণ বিদ্রোহগুলির সংগঠনের ক্ষেত্রে ধর্ম সম্প্রদায় ও জাতিগত দিকগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।[৩৫]

ঔপনিবেশিক বাংলায় কৃষক বিদ্রোহগুলির মধ্যে 'শ্রেণি ধারণা', 'কৃষক ধারণা' ও 'বিদ্রোহের ধারণা' প্রকাশ পেয়েছিল। এখানে শ্রেণি বলতে মার্কসীয় চিন্তার জগতে অর্থনৈতিক

সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এটা বুঝতে হবে যে, 'যৌথ শ্রেণী' শব্দটি একটি শ্রেণীর সচেতনতা নাও হতে পারে এবং 'শ্রেণী' শব্দটি একটি শ্রেণীর মধ্যে নিজস্ব শ্রেণিচেতনা এবং এখান থেকে উন্নত হয়ে নিজের থেকে পৃথক চেতনা বিকাশকে বোঝানো হয়েছে। এখানে 'কৃষক শ্রেণী' বলতে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং ভূমিহীন কৃষক অবস্থানটিকে বোঝানো হয়েছে। আবার কৃষক বিদ্রোহ বলতে শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক শ্রেণীর যৌথ প্রতিবাদ, দাবি ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে। ঐতিহাসিক বিতর্কে না গিয়ে উপজাতি বিদ্রোহগুলিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। যথা- (১) প্রাক মহাবিদ্রোহ পর্যায়, (২)প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী পর্যায়, (৩)প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পর্যায়।[৩৬]

প্রাক-মহাবিদ্রোহের পূর্বে উপজাতি বিদ্রোহগুলির মধ্যে কোল, ভিল, সাঁওতাল চুয়াড় ইত্যাদি বিদ্রোহগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা লেফটেন্যান্ট গভর্নর হেলিডে বলেছেন যে, এই বিদ্রোহের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানো। উপজাতি বিদ্রোহগুলি ছিল কৃষক বিদ্রোহ। সাঁওতাল বিদ্রোহের কেবলমাত্র সাঁওতাল আদিবাসীগন অংশগ্রহণ করেনি, স্থানীয় কুমোর, বেলি, কর্মকার, মুসলিম তাঁতি, চামার, ডোম প্রভৃতি সম্প্রদায় ও পেশার মানুষের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এই বিদ্রোহগুলি কেবলমাত্র জমিদার ও মহাজন বিরোধী ছিল না, এগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাতে চেয়েছিল।

আবার প্রাক-মহাবিদ্রোহের সময় কালে সন্ন্যাসী, ফকির, পাবনা, পাগলাপন্থী ও সন্দেশের বিদ্রোহ ছিল গুরুত্বপূর্ণ।তবে এই বিদ্রোহগুলি কৃষক শ্রেনি চরিত্র চেতনা অনেকটা সুপ্ত ছিল। সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ শ্রেণি চরিত্রের সঙ্গে কৃষক চরিত্র, সামাজিক প্রতিপত্তি ইত্যাদি মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। ১৭৭৮ সালে "বাজে জামিন আইন' অনুযায়ী কর্নওয়ালিশ যখন খাজনা মুক্ত জমি অধিগ্রহনের কথা ঘোষণা করলেন তখন সন্ন্যাসিদের বিদ্রোহ ও দরিদ্র কৃষক বিদ্রোহে সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, উপজাতি বিদ্রোহগুলির মধ্যে সম্প্রদায়গত, ধর্মগত ও জাতিগত চেতনা প্রচ্ছন্ন ছিল, অপরদিকে সন্ন্যাসী, ফকির, ওয়াহবী, ফরাজী ইত্যাদি বিদ্রোহের মধ্যে সম্প্রদায়, জাত, পাত, ধর্ম, বর্ণের প্রকটতা অধিক ছিল।[৩৭]

তথ্যসূত্র:-

১. J.C. Price, The Changing Land Szstem of the Tribals of Chhotonagpore, 1771-1831, Tarasankar Banerjee (ed.), Changing Land Szstem and Tribals in Eastern India in Modern period, Subarnarekha, Calcutta, 1979, p.7

২. Kumar Suresh Stag, Tribals Movements in India, Munshiam Marahashal, New Delhi, 1982, p.162

৩. Ranjan Chakrabarti (ed), Does Environmental History Matter? Readers Services, Kolkata, 2006, p.91

৪. সুপ্রকাশ রায়, সাঁওতাল বিদ্রোহ, রাডিক্যাল পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০০৮, পৃষ্ঠা. ৩১

৫. Debendranath Mahato, Jungal Mahal, chuar Bidroha O Samakalin Bhumi Byabastha, p.52

৬. K.K. Friminger, Bengal Districts Records Midnapore:1763-1767, p.156

৭. A.K. Jemson, Final Report on Survey and Settlement operation in the Districts of Midnapore: 1901-1917, p163

৮. Ibid, p.164

৯. Law Report Commission,1817

১০. B.H. Baden Powel, Land Szstem of British India, vol.1, pp.577-79

১১. A.K. Jemson, op.cit.,p.102

১২. Debendranath Mahato, op.cit.,pp.59-60

১৩. Rampada Chatterjee, Extract From the Final Report on urvey and Settlement on the Government and the temporay settled Estate and of private Estate in the Districts Midnapore, 1903-11, pp. 24-27

১৪. ডঃ তারাশঙ্কর পানিগ্রাহি, ব্রিটিশ শাসনের আদি পর্ব ও মল্লভূমের গ্রামীণ অর্থনীতি, ১৭৫৭-১৮৩৩, পৃষ্ঠা. ৫৭

১৫. যোগেশ চন্দ্র বসু, মেদিনিপুরের ইতিহাস প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা. ২৩৭

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা. ২৩৮

১৭. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃষ্ঠা. ৫৭

১৮. যোগেশ চন্দ্র বসু, ঐ, পৃষ্ঠা. ২৩৯

১৯. সুমিত্রা মিত্র, সদর মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলন, পৃষ্ঠা. ৩

২০. চিত্তব্রত পালিত, চুয়াড় বিদ্রোহের স্বরূপ, ডঃ মৃণাল কান্তি শতপথি (সম্পাদিত), উপজাতি আন্দোলন, ২০১২, পৃষ্ঠা. ৭৭

২১. H.H. Risley, Tribals and Castes of Bengal, 1891, p.75

২২. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস, ২০১৩, পৃষ্ঠা. ৭৫-৭৭

২৩. Ranjan Chakraborty, New Directions in History: Environental History, Readers Service, Kolkata, 2006, p.387

২৪. সুপ্রকাশ রায়, ঐ, পৃষ্ঠা. ৩৩৯

২৫. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, ঐ, পৃষ্ঠা. ৫৯-৬০

২৬. সুপ্রকাশ রায়, ঐ, পৃষ্ঠা. ৪৩

২৭. সংবাদ প্রভাকর, ১৮৫৫

২৮. তদেব, ২০শে জুলাই, ১৮৫৫

২৯. Manoj Sahare (ed), Life & Movements of Birsa Munda, 2021, Publishers-Dr. V.D. Ghosh, Maharastra, p.11

৩০. Ibid, pp.11-14

৩১. Ibid, pp.38-40

৩২. Ibid, pp.47-48

৩৩. Ibid, pp.42-48

৩৪. Sarat Chandra Roy, Mundas and their country, Kuntal Line Press, Calcutta, 1960, p.356

৩৫. A.V. Chayanov, The theory of peasant Economy, UWP, 1986

৩৬. Deniel, The Agrarian Prospect in India, Delhi, 1956, p.4

৩৭. Devid Hardiman, ed., Peasant Residence in India: 1858-1914, pp.2-3

ABOUT THE BOOK

Peasants and workers are the main backbone of the society who trying their best without any covetous attitude and selfishness dedicating their lives provides food, cloth and important amenities to the every section of the people in the society through the ages. No society would be existed without their assistance and contribution. In spite of that these peasants and labourer are neglected, exploited, deprived and abhorred by the upper strata of the society who have to tolerate the atrocities of the elite people to be a retrograded class in the society. Their unconditional contribution and dedication to the society and nation in whole over the world is not placed in the history. In the context of the history of Bengal, nay India no sufficient attempt has been taken to explore the contribution and their history of atrocities and life- pain. In the present book an initiative has been taken to explore and expose the history of the neglected and exploited peasants and labourer without any biasness and prejudices.

ABOUT THE EDITORS

Dr. Kartik Chandra Sutradhar, Associate Professor, Department of History, Cooch Behar Panchanan Barma University, Cooch Behar, West Bengal, India, is renowned author and scholar specially writing on the different aspects of the History of North Bengal including North East India. He has authored forty books and contributed many articles in the edited books, national and international journals and periodicals. He participated in many regional, national and international seminars, conference and workshops with presenting papers and delivering special lectures on various topics. He has also chaired many technical sessions in National and International seminars. He interested mainly to work for the people of subaltern and depressed classes such as peasants, workers, so called lower castes and the tribal people as well as environment. He believes in scientism, positivism and secularism in real sense in his writings and guiding on research works without any bias and prejudices.

Kalikrishna Sutradhar, Ph.D. Research Scholar, Department of History, Cooch Behar Panchanan Barma University, Cooch Behar, West Bengal, India, is author & scholar specially writings on the different aspects of the History of North Bengal. He has edited book, namely *"Bicchinnatabader Utsa O Ovimukh : Prasanga Uttarbanga"* (Bengali language), *"Uttarbanger Swadhinata Andoloner Itibritta"* (Bengali Language) & written one book with Dr. Kartik Chandra Sutradhar, namely *"Itihas O Oithiye Kamrup-Kochbehar"* (Bengali language). He is the Associate editor of a journal "Journal of Historical Studies and Research". He has contributed many articles in the edited books, national and international journals and periodicals. He has also participated in many regional, national and international seminars, conference and workshops and presented papers on various topics particularly on the history of North Bengal.

KUNAL BOOKS
(Publisher & Distributors)
4648/21, First Floor, Ansari Road, Daryaganj
New Delhi-110 002 (India)
Ph.: 011-23275069, Mob.: 9811043697, 9868071411
E-mail: kunalbooks@gmail.com
Website: www.kunalbooks.com

₹1495/-

ISBN 978-93-91908-52-2